ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের প্রাক্‌কালীন বর্ণনা

Talks delivered by Swami Samarpanananda before the students of Indian Spiritual Heritage classes at Ramakrishna Mission Vivekananda University, Belur Math

(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

মহাভারতে এক লক্ষ শ্লোক আর সমস্ত পুরান মিলিয়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ শ্লোক হয়ে যায়। ভাগবত পুরানের প্রথম খণ্ডে প্রায় বারো হাজারের কিছু বেশি শ্লোক আছে, এই রকম চল্লিশটা মোটা মোটা খণ্ড হলে তবে গিয়ে সমগ্র পুরানকে সন্নিবেশিত করা যাবে। এরপর আবার আঠারোটা উপ-পুরান আছে। হিন্দু ধর্মের যা কিছু শক্তি এই পুরান আর উপপুরানই হল তার উৎস। পুরানের যে কোন কাহিনীই অন্য পুরানেও কোথাও না কোথাও পাওয়া যাবে। পুরান দিয়েই বোঝা যায় হিন্দু ধর্মের বিশালত্বটা কতখানি। মোটামুটি সব পুরান একই কথা বলছে। কিন্তু কিছু কিছু দেবতাদের স্তুতি গুলি পাল্টে যাবে, কাহিনীও কোথাও কোথাও পাল্টে যাবে, কিন্তু বংশ আর বংশানুচরিতের বর্ণনা কোথাও পাল্টাবে না। দশম স্কন্ধই ভাগবতের সব থেকে উল্লেখনীয় স্কন্ধ। এই স্কন্ধ প্রধানত শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব আর তাঁর লীলাকে আধার করেই এগিয়েছে।

বংশ আর বংশানুচরিত বিশেষ করে সূর্যবংশ আর চন্দ্রবংশ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শোনার পর পরীক্ষিৎ শুকদেবকে বলছেন 'হে ভগবন্! আপনি সূর্যবংশ আর চন্দ্রবংশের কথা বললেন, তার সাথে যযাতির থেকে সৃষ্ট যদু বংশের ইতিহাসও আপনার কাছ থেকে বিস্তারিত ভাবে শুনলাম। পরিবর্তি কালে এই যদুবংশে স্বয়ং ভগবান নিজ অংশ রূপে বলরামের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছিলেন, আপনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম পবিত্র চরিত্র আমাদের শোনান। হে শুকদেব, আপনি যে এত কথা বললেন সব শোনার পর এখন শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র কথা শুনতে কুব আগ্রহ হচ্ছে'। ভাগবতের প্রারম্ভিক পর্যায়ে উল্লেখ করা আছে যে, মহাভারত রচনার পর ব্যাসদেবের মানসিক তৃপ্তি ও শান্তি পাননি। তাঁর মনের মধ্যে সব সময় একটা বিষাদ ও অতৃপ্তির ভাব যেন নাড়া দিত। ব্যাসদেবের মানসিক অতৃপ্তি ও অশান্তির অবস্থা নারদ জানতে পেরে ব্যাসদেবকে বলেছিলেন 'দ্যাখো বাবা, তুমি এক মহান কালজয়ী বিশাল সাহিত্য রচনা করেছ ঠিকই, কিন্তু তাতে তুমি ভগবানের কথা সেই

অর্থে বিশেষ ভাবে বর্ণনা করোনি। মহাভারতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, যুদ্ধ, নীতিকথা খুবই আছে কিন্তু ঈশ্বরের কথা সেভাবে কিছুই নেই। সেইজন্য তোমাকে বলছি, তুমি ভগবানের কথা কিছু লেখ’। যদিও এর আগের স্কন্ধগুলিতে কিছু কিছু ভগবানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু দশম স্কন্ধে পুরোপুরি শুধু ভগবানের লীলাকথারই বর্ণনা করা হয়েছে।

পরীক্ষিৎ শুকদেবকে বলছেন ‘আমার এই শরীর, যে শরীরে আমি আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এই শরীরকে যিনি অশ্বত্থামা দ্বারা নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং কৌরব আর পাণ্ডব এই দুটো বংশেরই যিনি সহায় ছিলেন, তাঁর কথা আপনি আমাকে বলুন’। পরীক্ষিৎএর মূল কথা বক্তব্য হল শ্রীকৃষ্ণ শুধুমাত্র ভগবান, সাক্ষাৎ নারায়ণ যিনি, যিনি জগতের মঙ্গলার্থে অবতার রূপে নেমে এসেছেন, সেই তিনি আমার উপর বিশেষ কৃপা করেছেন। ব্যাপারটা দুই রকমের হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার রূপে এসেছেন, সাক্ষাৎ নারায়ণ, তার একটা মাহাত্ম্য আছে, আবার সেই সাক্ষাৎ নারায়ণ কারুর উপর বিশেষ কৃপা করেছেন, তার ক্ষেত্রে সেটা হয়ে গেল দ্বিগুণ, একেই তিনি ভগবান আবার তিনি তাঁকে বিশেষ কৃপা করেছেন। তাই পরীক্ষিৎ বলছেন যে আমি তাঁর ব্যাপারে বিশেষ রূপে আগ্রহ, আপনি তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারতি ভাবে বলুন।

এখানে ভাগবতে একটা খুব সুন্দর শ্লোক পাওয়া যায়, এই শ্লোকের মাধ্যমে বোঝা যায় হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য এবং ঈশ্বর ও জীবের সম্পর্ক নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কিভাবে এগিয়েছে। শুকদেবের কাছে পরীক্ষিৎ জানতে চাইছেন - *বীর্যাণি তস্যাখিলদেহভাজামন্তর্বহিঃ পুরুষকালরূপৈঃ। প্রযচ্ছতো মৃত্যুমুতামৃতং চ মায়ামনুষ্যস্য বদস্ব বিদ্বন্।।১০/১/৭।* এই যে শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই স্বয়ং নারায়ণ, আর যত দেহধারী আছে সমস্ত প্রাণীর ভেতরে অন্তর্যামী রূপে অবস্থিত হয়ে সবাইকে তিনি তাঁর অমৃতত্ব ও বীর্য দান করছেন। হে মুনিবর! সেই মায়া-মনুষ্যধারী ভগবানের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য রসে পরিপূর্ণ লীলাকথা আমাদের বলুন। এই শরীর কেন চলছে? ভগবান ভেতরে অন্তর্যামী রূপে আছেন বলেই চলছে। তিনি যদি ভেতরে না থাকেন তাহলে এই শরীরটাই একটা জড় পদার্থ রূপে পড়ে থাকবে। এই মানবদেহ যতক্ষণ সজীব আছে ততক্ষণ মানব চেষ্টা করলে মুক্তি লাভ পর্যন্ত করতে পারে। তার মানে, যিনি নারায়ণ, যিনি অমৃতত্ব দিচ্ছেন, তিনি চাইলে আমাদের মুক্তিও দিয়ে দিতে পারেন। একদিকে তিনি ভেতরে বসে অমৃতত্ব দিচ্ছেন আবার

তিনি সর্বব্যাপী কাল রূপে সবাইর মুক্তি দিয়ে যাচ্ছেন। কালের অর্থ হয় সময়। কিন্তু এখানে কাল মানে মৃত্যু, কাল রূপে তিনি সব গ্রাস করে নেন। এটাই ভগবানের লীলা - একদিকে তিনি অন্তর্যামী হয়ে আমাদের অমৃতত্ব দান করছেন তিনিই আবার কাল হয়ে আমাদের গ্রাস করছেন।

পরীক্ষিৎ তখন উত্তরার গর্ভে, সেই সময় অশ্বত্থামা পরীক্ষিতের উপর চালিয়ে দিয়েছিল ব্রহ্মাস্ত্র। যুধিষ্ঠির তখন শ্রীকৃষ্ণের একান্ত শরণাপন্ন হয়ে নিতান্ত কাতর স্বরে বলছেন – আমাদের বংশ লোপ পেয়ে যাচ্ছে প্রভু, আপনি রক্ষা করুন। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কাতর অনুরোধে তখন উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করে নিজের আবরণ দিয়ে ব্রহ্মাস্ত্র থেকে পরীক্ষিৎকে রক্ষা করলেন। ব্রহ্মাস্ত্রের তাপ পরীক্ষিৎ পর্যন্ত যেতে পারছিল না, কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্রের আলোটা দেখতে পারছিল আর বুঝতে পারছে আমাকে একজন রক্ষা করছেন। জন্ম নেওয়ার পর সেই গর্ভস্থ সন্তান সবার মুখের দিকে তাকিয়ে ঈক্ষণ করে বুঝতে চেষ্টা করছিল, কে সেই তিনি যিনি আমাকে রক্ষা করেছিলেন। সেইজন্য তাঁর নাম হয়েছিল পরীক্ষিৎ, জন্মের পর পরীক্ষা বা ঈক্ষণ করছিলেন। সেই পরীক্ষিৎ এখন শুকদেবের কাছে জানতে চাইছেন সেই ভগবানের কি বৈশিষ্ট্য, যিনি ভেতরে থেকে সমস্ত প্রাণীকে অমৃতত্ব আর তাঁর বীর্যপ্রদান করছেন আর বাইরে থেকে তিনি মৃত্যু দিচ্ছেন।

এই ব্যাপারে একটা মজার ঘটনা বললে আরো পরিষ্কার হবে। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে গলায় ক্যানসার রোগগ্রস্ত হয়ে ঠাকুর শয্যাশায়ী। সেই অবস্থায় একদিন স্বামীজীর গর্ভধারিণী কাশীপুরে এসেছেন ঠাকুরের সঙ্গে ঝগড়া করতে। বলছেন 'সামনে আইন পরীক্ষা, নরেন একেবারেই পড়াশুনা করছে না, সারাদিন ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়'। শুনে ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলছেন 'নরেন তুই শিগ্‌গিরি বাড়ি যা, বাড়ি গিয়ে লেখাপড়ায় মন দে'। তা নরেনকে নিয়ে তার মা গাড়ি করে যাচ্ছেন আর নরেনকে বলছেন 'দেখলিতো, ঠাকুরও বলছেন তোকে বাড়িতে গিয়ে পড়াশোনাটা করতে'। নরেন বলছেন 'হ্যাঁ, তিনি চোরকে বলেন চুরি কর আর গৃহস্থকে বলেন জেগে থাক। তা, তিনি সাপ হয়ে কামড়ান আর ওঝা হয়ে ঝাড়েন'। সবটাই তাঁর, ভালোটাও তাঁর মন্দটাও তাঁর। সেই ভগবানের লীলাকথা পরীক্ষিৎ শুকদেবের কাছে শুনতে চাইছেন। পরীক্ষিৎ বলছেন *নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুণ্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে। পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্।।১০/১/১৩।* হে শুকদেব, আমার মৃত্যু

আসন্ন। আমি শুধু অন্নই নয় জল পর্যন্ত পরিত্যাগ করে দিয়েছি, তথাপি এই দুঃসহ ক্ষুধা-তৃষ্ণা (যে কারণে আমি মুনির গলায় মৃত সাপ ঝুলিয়ে যে অন্যায় কাজ করেছিলাম) আমাকে সামান্যতম কষ্ট দিচ্ছে না। তার কারণ আমি আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত ভগবৎলীলামৃত অবিরাম পান করে চলেছি।

এটাই ভগবানের লীলার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য, যেটা সাধারণ মানুষ বা কোন দেবতাও পারবে না। অন্যান্য যত জীব আছে, দেবতা, গন্ধর্ব, মানুষ, যাই বলুন এরা সবাই শুধু একটা জিনিষই পারে কিন্তু ভগবান দুটো বিপরীত ধর্মী জিনিষ করতে পারেন। প্রাণীর সঙ্গে ভগবানের এটাই পার্থক্য। ভগবান আমাদের জীবনও দিতে পারেন আবার মৃত্যুও দিতে পারেন, কেননা দুটোরই তিনি পারে কিনা। সমুদ্র মন্থনের সময় যখন লক্ষ্মী উঠে এলেন তখন তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন কার কাছে যাবেন। তিনি ঋষি, মুনি, দেবতা সবারই মধ্যে কিছু না কিছু দোষ বা ঘাটতি দেখছেন, আর যখন ভগবান বিষ্ণুর কাছে গেছেন তখন দেখছেন তাঁর কোন দিকে ভ্রুক্ষেপই নেই, লক্ষ্মীদেবীকে কোন পাত্তাই দিচ্ছেন না। লক্ষ্মী তখন তাঁর আশ্রয় নিলেন। কারণ তিনি এই জগতের সব কিছুর বাইরে। তিনি রাগ আর বিরাগ এই দুটোরই পারে, সেইজন্য তিনি এই দুটোই দিতে পারেন। একটা জিনিষের প্রতি আসক্তি তিনিই দিচ্ছেন আবার সেই জিনিষের প্রতি বৈরাগ্য সেটাও তিনিই দেন। একটা জিনিষের প্রতি যে প্রবৃত্তি আসে সেটাও তিনি দেন আবার সেই জিনিষ থেকে সরে আসার যে নিবৃত্তি সেটাও তিনিই দেন, কারণ তিনি এই দুটোরই পারে। শুকদেব বলছেন – *বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি। বক্তারং পৃচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎ পাদসলিলং যথা।।১০/১/১৬।* ভগবানের লীলাকথার ব্যপারে যখন কোন প্রশ্ন করা হয় তখন ‘*বক্তারং পৃচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎ পাদসলিলং যথা*’ – অর্থাৎ যিনি প্রশ্ন করেছেন, যিনি উত্তর দিচ্ছেন আর এর যাঁরা শ্রোতা এই তিনজনই পবিত্র হয়ে যান। বলছেন যেমন গঙ্গার জল আর শালগ্রাম শীলার স্পর্শ দ্বারা সবাই পবিত্র হয়ে যায়, ঠিক সেই রকম নিখিলকলিকলুষহারি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরতিকথার প্রশ্নকর্তা, বক্তা আর শ্রোতা এই তিন জনকেই পবিত্র করে।

পুরানের ট্রাডিশানে একমাত্র নারায়ণই অবতার হয়ে আসেন, শিব অবতার হননা, তিনি সাক্ষাৎ আসেন, বা অন্য কোন দেবীরাও অবতার হননা। পুরানের একটা খুব সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, ভগবান নারায়ণকে অবতার হয়ে আসার প্রারম্ভিক কাহিনী সব পুরানে একই

ভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে। জগতে কারুর একটা সমস্যা হয়, সে তখন সেই সমস্যা নিয়ে ব্রহ্মার কাছে দৌড়ে যাবে, ব্রহ্মা আবার সেটা ভগবান বিষ্ণুর কাছে গিয়ে বলবেন, তখন সেই সমস্যার সমাধানের জন্য ভগবান অবতরণ করেন। পুরানে সবচেয়ে বেশী সমস্যা হয় পৃথিবীর। পৃথিবী তখন গরুর রূপ ধারণ করে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বলবে আমি পাপের বোঝা আর বইতে পারছি না, আপনি কিছু করুন। তখন ব্রহ্মা আবার যাবেন ভগবান বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণু তখন বলবেন – ঠিক আছে আমি অবতার রূপ ধারণ করে যাচ্ছি। অধ্যাত্ম রামায়ণেও এই একই কাহিনী। কিন্তু সেখানে বলা হয় রাবণের পাপে সবাই জর্জরিত। তখন ভগবান বিষ্ণু শ্রীরামচন্দ্র রূপে অবতার হয়ে রাবণকে বধ করবেন। এখানে এবার কংসাদিকে বধ করবার জন্য ভগবান স্বয়ং নররূপ ধারণ করে আবির্ভূত হবেন।

এখানেও পৃথিবীর সমস্যা হয়ে গেছে, সে এখন গরুর রূপ ধারণ করে ব্রহ্মার কাছে গেছে। এটা জানা যায়না পৃথিবীর যখনই কোন সমস্যা হয় সে কেন সব সময় গরু রূপই ধারণ করে। অধ্যাত্ম রামায়ণেও আমরা এই একই ব্যাপার পাই। যাই হোক সব দেবতা, ব্রহ্মা আর পৃথিবী সবাই ক্ষীর সাগরের তীরে পৌঁছে গেলেন। সেখানে ভগবানকে পুরুষসুক্তম দিয়ে বন্দনা করা হল। ভগবান তখন তাদের সামনে আবির্ভূত হয়ে বলছেন 'আমি জানি পৃথিবীতে এই সমস্যা হচ্ছে, আমি যাব পৃথিবীতে, কিন্তু তার আগে দেবতারা যত আছে সবাই তোমরা যদু বংশে গিয়ে জন্ম নাও'। ভগবান আরো বলে দিলেন যে তাঁর প্রিয়তমা লক্ষ্মী তিনি শ্রীরাধা হয়ে সেখানে জন্ম নেবেন আর তাঁর সেবার জন্য অন্য অনেক গোপীরাও যাবেন।

বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্। অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকির্ষয়া।।১০/১/২৪। এটা একটা মজার ব্যাপার যাঁরা শ্রীকৃষ্ণলীলার খুব ভক্ত তাঁরা শ্রীরাধাকে লক্ষ্মী রূপেই দেখেন। কিন্তু গুজরাটের দিকে শ্রীরাধাকে লক্ষ্মী রূপে মানে না, ওখানে রুক্মিণীকেই লক্ষ্মী রূপে মানা হয়। কিন্তু যারা ভক্তিমার্গী, বিশেষ করে বৃন্দাবনের ভক্তরা শ্রীরাধাকেই মানে। তারপর বলছেন – যিনি শেষনাগ আছেন, তিনি আমার দাদা বলরাম হয়ে জন্ম নেবেন। এখানে খুব সুন্দর একটা বিশ্লেষণ আছে, বলছে, শেষনাগ হচ্ছেন ভগবানের কলা – *বাসুদেবকলানন্তঃ*। কথামৃতে ঠাকুর প্রায়ই এই প্রশ্ন করছেন 'তোমার কি মনে হয়'; যদি বলল অবতার বলে মনে হচ্ছে। তখন আবার জিজ্ঞেস করছেন 'কলা না অংশ';

অনেক ভক্তই কলা আর অংশে গোলমাল করে ফেলেন। কলা আর অংশ ভাগবতের নিজস্ব তত্ত্ব। অংশ বললে ভগবানের যে কোন ভাগ নিয়ে আসা যেতে পারে, এক ভাগ, কি দুই ভাগ, বা পয়েন্ট এক ভাগ, জিরো পয়েন্ট এক ভাগ, পয়েন্ট দুই ভাগ বার তার চাইতে বেশিও হতে পারে। আর কলা হয় ষোলটি, চন্দ্রমার যেমন ষোলটি কলা। যখন কলা বলা হয় তখন তা কখনই শতকরা ছয় ভাগের নীচে যাবে না, এক কলা, দুই কলা, তিন কলা – এখানে এক কলার নীচে হয় না। অংশ অবতারে ছোটও হতে পারে বেশিও হতে পারে, শতকরা নব্বুই ভাগও হতে পারে, কত হবে বলা মুশকিল। কিন্তু কলার ক্ষেত্রে কি হয় একটা ভাগের নীচে সে আর আসবে না। এইখানে যে কলা বলছে, মানে কলা অবতার হচ্ছে উচ্চতম অবতার। আর অংশ অবতার হচ্ছে খুব ছোট। এই ব্যাপারটা অনেকেই গোলমাল করে ফেলে। কিন্তু ভাগবতের এই শ্লোকটা জানা থাকলে বুঝতে অসুবিধা হবে না।

শেষনাগ ছিলেন কলা অবতার। ভগবানের যে অংশ অবতার তিনিও অনন্ত। কেননা ভগবান নিজে যদি অনন্ত হন, তাহলে তাঁর অংশটাও অনন্ত হবে। অনন্তের কোন অংশ হয় না। এটাই অদ্বৈতের মূল তত্ত্ব। আমাদের মনটা আসলে পুরোপুরি সান্ত, আমরা অনন্ত বলতে বড়জোর সমুদ্র, আকাশকে ভাবব, কিন্তু এগুলোও সান্ত। অনন্তের ভাব পুরো আলাদা। একটা উপমার সাহায্যে এই অনন্তের ভাবটাকে কিছুটা বোঝান যেতে পারে। মনে করা যাক একটা হোটেল আছে, যার প্রত্যেকটি ঘরে এক, দুই, তিন, চার সব নম্বর দেওয়া আছে, আর এই রকম অনন্ত সংখ্যার ঘর আছে। এইভাবে হোটেলের ঘরের সংখ্যা অনন্ত। আর প্রত্যেকটি ঘরেই লোক আছে। এবার হঠাৎ একজন লোক এসে বলল আমাকে ঘর দিন। এখন তাকে ঘর কিভাবে দেওয়া হবে? আমার যদি দশটা ঘর থাকে, এখন দশটা ঘরে দশ জন লোক আছে, আরেক জন লোক এলে তাকে আর জায়গা দেওয়া যাবে না। কিন্তু এই হোটেলে অনন্ত সংখ্যার ঘর আছে, আর প্রত্যেকটি ঘরে লোক আছে, এখন আরেক জন লোক এলে তাকে ঘর দিতে পারা যাবে কিনা? খুব সহজেই জায়গা দেওয়া যাবে। কিভাবে? এক নম্বরে যে আছে তাকে বলা হবে দুই নম্বর ঘরে চলে যেতে, দুই নম্বর ঘরের লোককে বলবে তিন নম্বর ঘরে চলে যান, তিনকে বলবে চারে চলে যান। এখন এই পুরো সিরিজটা নড়তে শুরু করবে। শেষে কোথায় থামবে? কোথাও থামবে না, কেননা ঘরের সংখা অনন্ত। শুধু একজনকেই নয়, যদি অনন্ত সংখ্যায় লোক এসে যায়, তবে ঐ ভাবে অনন্ত লোককে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে। এই

হোটেলের যে মুনাফা হবে, তখন কত মুনাফা হবে? মুনাফাও অনন্ত হবে। যদি লোকসান হয় তাহলে লোকসানও অনন্ত হবে। অনন্ত লোকসানের পর কত মুনাফা থাকবে, মুনাফাও অনন্ত থাকবে। অনন্তের কথা বললেই লোকের মাথা ঘুরে যাবে। এই কারণেই অনন্ত ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারিনা। এই অনন্তকে আমরা ধারণা করতে পারিনা বলেই বিভিন্ন মতবাদের, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সৃষ্টি হয়। অনন্তকে আমরা যেভাবে দেখব আমাদের অধ্যাত্মবাদও সেইভাবে জন্ম নেবে। এখন এই গল্পে যেখানে একটা অনন্ত সংখ্যার ঘর বিশিষ্ট হোটেলের ব্যবসার কথা বলা হল, এখানে ক্ষতির পরিমাণ অনন্ত, লাভের পরিমাণ অনন্ত, কত ট্যাক্স ভরতে হয়েছে, অনন্ত ট্যাক্স দিতে হয়েছে, এগুলো শুনলে আমাদের গাঁজাখুরির গল্প বলেই মনে হবে। কিন্তু অনন্তের ব্যাপারে এটাই হয়। যারা বলবেন – হ্যাঁ, এটা পুরোপুরি যুক্তিযুক্ত ও সম্ভব, তারাই অদ্বৈতবাদকে ধরতে পারবে, তা নাহলে অদ্বৈত বোঝা অসম্ভব। অনন্তকে এইজন্য কিছুতেই বোঝা যায় না। অনন্তের অংশ অনন্তই হয় সেটা কখনই অংশ হয় না। পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিয়ে নিলে পূর্ণই থাকবে। ফিজিক্সে যখন infinite এসে যায় তখন বিজ্ঞানীরা সব কিছু ওখানেই বন্ধ করে দেয়, বলে এই নিয়ম আর চলবে না। অনন্ত থেকে অনন্ত বিয়োগ দিলে কত হবে? অনন্তই হবে জিরো হবে না। যদি জিরো আর অনন্তকে নিয়ে খেলা করেন তাহলে যে কোন একটা জিনিষ দিয়ে অন্য কোন জিনিষকে প্রমাণ করে দেওয়া যায়। অনন্তকে ধরা খুব মুশকিল, অঙ্কের বিশারদরাও অনন্তের ব্যাপারে হাত তুলে দেয়। আমাদের বোঝার সহজ ব্যাপার হল অনন্তকে অনন্তের সঙ্গে যোগ করলে অনন্তই থাকবে, আবার অনন্ত থেকে অনন্তকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তখনও অনন্তই থাকবে। এই ব্যাপারটাই আমাদের মন মেনে নিতে চায়না, সেইজন্যই আমরা ঈশ্বর তত্ত্ব বুঝতে বা ধারণা করতে পারিনা।

যাই হোক, ভগবানের এবার পুরো দলবল, শেষনাগ, যোগমায়া, দেবতারা বিভিন্ন জায়গায় অবতরণ করে গেছেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধ শুধু ভক্তি শাস্ত্রই নয়, ভক্তির পরাকাষ্টা। যারা ভক্তি রসে ডুবে থাকতে চান তাদের কাছে এই ভাগবত ছাড়া আর অন্য কিছু নেই, ভক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা ভাগবতের উপরে আর কিছু নেই। কিন্তু যাঁরা একেবারে ভক্তি রসে হারিয়ে যেতে চান তাঁদের আগেকার দিনের বিভিন্ন আচার্যদের দ্বারা রচিত দশম স্কন্ধের

ভাষ্য সহ এই দশম স্কন্ধ অধ্যয়ন করতে হবে। শ্লোকের একেকটা লাইনকে নিয়ে এনারা পাতার পর পাতা জুড়ে ব্যাখ্যা করে গেছেন।

কাহিনী আমাদের সকলেরই মোটামুটি জানা। কংস মথুরার রাজকুমার ছিলেন, তার জ্যাঠতুতো বা খুড়তুতো বোন হলেন দেবকী। বসুদেবের সাথে দেবকীর বিবাহ হয়েছে। বিয়ে করে নববধুকে নিয়ে বসুদেব রথে করে যাচ্ছেন, আর সেই রথের সারথি কংস নিজে। সেই সময় আকাশে এক দৈববাণী হল – যে দেবকীকে তুমি এত আদর যত্ন খাতির করে নিয়ে যাচ্ছ, এই দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমাকে বধ করবে। দৈববাণী শুনেই কংস খুব ভয় পেয়ে ঘাবড়ে গেল। তখনই কংস রথের গতিমুখ পরিবর্তন করে সোজা গারদে নিয়ে এসে দেবকীকে বধ করবার জন্য বন্দী করে রাখল।

বসুদেব খুব বুদ্ধিমান, সৎ ও ঋষিতুল্য পুরুষ ছিলেন। বসুদেব জানতেন কোন প্রকারে এই উপস্থিত কালটুকু পার করে দেওয়াটাই এখন আশু কর্তব্য। ঢিলেমি করার জন্য কংসকে বুঝিয়ে তিনি বলছেন *মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে। অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ।।১০/১/৩৮।* ‘যিনি জন্ম নেন তার শরীরের সঙ্গেই মৃত্যুও জন্য নেয়। আজ হোক বা একশো বছর পরেই হোক প্রাণীমাত্রেরই মৃত্যু নিশ্চিত’। আপনি আমি যে জন্ম নিয়েছি, আমাদের মৃত্যুও কিন্তু আমাদের সঙ্গেই এসেছে। এই শ্লোকটি পড়লেই অবাক হয়ে যেতে হয় – জন্মের সঙ্গে মৃত্যুও জন্ম নিয়েছে। মডার্ন বায়োলজিতে বলে জেনেটিকসে যখন কোন সেল জন্ম নেয় তখন ঐ সেলের মধ্যে একটা বিশেষ জিন থাকে যার কাজ আয়ু মাপা। ঐ জিনটা যেমন যেমন কমতে থাকে ঠিক সেইভাবে মানুষের আয়ু কমতে থাকে। যে মুহুর্তে জিরোতে এসে গেল তক্ষুণি সে মরে যাবে। আর একটা সেল মরে গেলে সব কটা সেল মরে যাবে। মজার জিনিষ যখন শরীরের জন্ম হয় তখন ঐ জিনটারও জন্ম হয়, আর তার একটা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য আছে। যেমন যেমন সময় যাবে তেমন তেমন ওর দৈর্ঘ্যও কমতে থাকে। শুরুতে যে সেল ছিল তার যে মাপ ছিল, ধরুন এক আঙুল ছিল সেটা এতদিনে অর্ধেক আঙুল হয়ে গেছে, এখন শরীরে নতুন যে সেল জন্ম নেবে সেটা অর্ধেক আঙুল নিয়ে জন্ম নেবে। তারপর অর্ধেক আঙুল থেকে আরো ছোট হয়ে সিকি ভাগ হয়ে গেল, তখন যে নতুন সেল জন্ম নেবে তার সাইজও সিকি ভাগ হবে। আর যখনই ঐ জিনটা জিরোতে পৌঁছে যাবে তখনি মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। শুধু মানুষই নয়, প্রত্যেক

প্রাণীরই এই ভাবে মৃত্যু হবে। টাইম বোমায় যেমন টাইমটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে, প্রাণীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে বাস্তবে ঠিক তাই হয়, কমতে থাকে।

বসুদেব এটাই বলছেন, তখনকার দিনের লোকেরা তাঁদের সহজাত জ্ঞান থেকে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে বলেছেন। এনাদের ফিজিক্সের কথা জিজ্ঞেস করুন তাঁরা বলবেন আমরা জানিনা, কিন্তু এখানে ওনারা সোজাসুজি বলে দিলেন শরীরের জন্মের সাথে মৃত্যুও জন্ম নেয়। আজকের দিনে যারা মলিকুল্যলার বায়োলজির বিজ্ঞানী তারা আবিষ্কার করলেন যে হ্যাঁ, সেল যখন জন্ম নেয়, তখনই তার জিনের মধ্যে একটা সেল থাকে, আর মাপটা কমতে থাকে। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল কমার হারটা সবার ক্ষেত্রে এক রকমের হয় না। মনে করুন ঐ জিনটা এক মিটার লম্বা, প্রথম বছরে এক সেন্টিমিটার করে কমছে। এই হারে কমলে আপনার একশ বছরে মরার কথা। কখন কখন এমনো হতে পারে কোন বছরে পাঁচ সেন্টিমিটার কমে যাবে, আবার কখন কখন এমনও হবে পাঁচ বছরে এক সেন্টিমিটার কমবে। মানুষ যদি উপোসাদি করে তাহলে ওটা আস্তে আস্তে কমে। আবার যে খুব আনন্দে থাকে, অনেক বন্ধু বান্ধব আছে তারও আস্তে আস্তে কমবে। যাদের আবার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আর সব সময় উদ্বেগের মধ্যে থাকে তাদের খুব তাড়াতাড়ি কমতে থাকে। ভোগের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। কেননা চার্চিল অনেক বছর বেঁচেছিলেন, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে আপনার এত বয়স হয়ে গেছে কিন্তু আপনার শরীর এত ফিট থাকার রহস্যটা কি। চার্চিল খুব বিখ্যাত একটা উক্তি করেছিলেন, তিনি বলছেন – আমি যখন ছোট ছিলাম তখন ডাক্তাররা আমাকে বলেছিল মদ খাবেনা আর সিগারেট খাবে না, তাহলে তোমার শরীর ভালো থাকবে, আমি ডাক্তারদের কথা শুনিনি সেইজন্য এত ফিট আছি। চার্চিল প্রচুর মদ খেতেন আর ধূমপান করতেন। এর সঙ্গে তাই ভোগের কোন সম্পর্ক নেই। এর কমার হারটা নির্ধারিত হয় আমাদের মনের আবেগের উপর। মূল হল – জন্মের সঙ্গে মৃত্যুও জন্ম নেয়। বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা বলছেন – physical basis of death, এটিকেই ভাগবতে বলছে spiritual basis of death. কখনো কেন তাড়াতাড়ি কমছে, আবার কখনও কেন আস্তে আস্তে কমছে, এগুলোকে তারা এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আবার একেই অনেকে বলবে কর্মের জন্য এই রকম হচ্ছে।

বসুদেব কংসকে বলছেন *ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি। যথা তৃণজলৌকৈবং দেহী কর্মগতিং গতঃ।।১০/১/৪০।* মানুষ যেমন চলার সময় একটি পা জমিতে ঠিকমত রেখে তবেই অপর পা উত্তোলন করে অথবা জোঁক যেমন সামনের দিকটা এগিয়ে দিয়ে একটা আশ্রয় নিয়ে পেছনের আশ্রয়টা ছেড়ে দেয়, ঠিক তেমনি জীবাত্মার যখন শরীরটা ছেড়ে দেওয়ার সময় হয় তখন আরেকটা আশ্রয় অর্থাৎ জীবও নিজ কর্মানুসারে নতুন দেহ ধারণ করে পূর্বের শরীরটা ছেড়ে দেয়। সেই দেহ যে সব সময় মানব শরীর হবে তা নয়, সেটা প্রেতাত্মাও হতে পারে বা দেব শরীরও হতে পারে, অর্থাৎ কোন একটা শরীর ধারণ করে নেয়, শুধু যে বাতাস হয়ে থাকে তা নয়। এইজন্য জোঁকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে – *জলৌপবৎ* যেমন জোঁক আগে সামনের জমিটা ধরে নেয় তারপর পেছনেরটা ছাড়ে। জীবাত্মাও ঠিক সেই রকম আগে একটা শরীর না ধরা পর্যন্ত বর্তমান শরীরটাকে ছাড়বে না। পাখি একটা ডাল থেকে উড়ে আরেকটা ডালে গিয়ে বসবে। জীবাত্মার ক্ষেত্রে তা হয় না, জীবাত্মা সব সময় আগে একটা শরীর ধরে নেয়। বৃদ্ধাবস্থায় শরীর জীর্ণ হয়ে গেছে, বিছানায় নিস্তেজ অসার হয়ে পড়ে আছে, তবুও মরতে চায় না, পড়েই আছে, হয়রো কোমাতেই দিনের পর দিন পড়ে আছে, শরীর ছাড়ছেই না। ভাগবতেই এর কারণটা বলে দিচ্ছে, জীবাত্মা ঠিক করতে পারছে না কোন শরীরটা নেবে।

বসুদেব কংসকে বিরাট লম্বা ভাষণ দিয়ে যাচ্ছেন। এরকমটি করো না ভাই, সবাই নিজের কর্মের নিয়মে চলছে। এইভাবে অনেক রকম করে কংসকে বসুদেব বোঝাতে চেষ্টা করলেন, নানা রকমের ভয়, ভেদনীতি অবলম্বন করল যাত তার বুদ্ধি ভেদ হয়ে যায়, কিন্তু কংস কিছুতেই ছাড়বে না। বসুদেব দেখলেন এখন একটা বিপদ এসেছে। বিপদের ক্ষেত্রে যেটা করা উচিত, তা হল যতটা পারা যায় বিপদের সময়টাকে দূরে ঠেলে দেওয়া। যেমন বলে ‘শুভস্য শীঘ্রম্ অশুভস্য কালহরণম্’। এক দুর্বৃত্ত ছিল, তাকে রাজা ফাঁসির হুকুম দিয়েছেন। ফাঁসির হুকুম যখন হয়ে গেছে তখন তো তার খেলা শেষ। তখন সে রাজাকে বলছে ‘রাজামশাই, আপনি যে আমাকে ফাঁসি দিচ্ছেন, আমি কিন্তু সাধারণ লোক নই, আমি ঘোড়াকে উড়তে শিখিয়ে দিতে পারি’। রাজা তখন তার ফাঁসির দিনটা পিছিয়ে দিয়ে বলছে ‘আমি তোমাকে ছয় মাস সময় দিচ্ছি, এই ছয় মাসের মধ্যে তুমি আমার এই ঘোড়াকে উড়তে শিখিয়ে দাও, আর ছয় মাসের মধ্যে যদি না পার, তাহলে তোমার খেলা শেষ’। তখন

তার বন্ধুরা তাকে বলল ‘আরে কেন তুমি তোমার মৃত্যুটাকে দেরী করিয়ে দিলে ছয় মাসের জন্য, ঘোড়া কখন কি উড়তে পারে! আর তুমি কি কখন ঘোড়াকে উড়তে শেখাতে পারবে?’ তখন সেই লোকটা বন্ধুদের বলছে ‘ছয় মাসের মধ্যে অনেক কিছুই হতে পারে, এই রাজাটা মরে যেতে পারে, যদি মরে যায়তো আমি বেঁচে গেলাম, মাঝখানে হয়তো আমারও স্বাভাবিক মৃত্যু এসে যেতে পারে, আর কে জানে যে ঘোড়া উড়তে পারে না, শিখেও তো যেতে পারে’। মানে সব রকমের সম্ভবনা আছে। অশুভ জিনিষকে যতটা পারো সরিয়ে দাও, একটু যখন নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় পেয়ে গেলে, তারপরে দেখা যাবে। যখন সমস্যার ঝড় ওঠে তখন যতটা পারা যায় সময় পার করে নেওয়া যায়। আমারতো বিনাশ হয়ে গেছে, কিন্তু ঐটাকে যতটা আপনি ঠেলবেন ততটা বেঁচে আসার সম্ভবনা বেড়ে যায়। বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। প্রথমে একটা কালের বিধান আছে, একটা গ্রহের ফের চলছে, ঐ সময়টায় সর্বনাশ হতে পারে, একটু যদি ঠেলে দেওয়া যায় তাহলে ঐ গ্রহের ফেরটা পেরিয়ে যাবে।

যারা বুদ্ধিমান পুরুষ, যতক্ষণ তাদের বুদ্ধি আর তাদের শক্তি কাজ দিচ্ছে ততক্ষণ মৃত্যুকে দূরে ঠেলে যেতে হয়। যত রকম ভাবে পারো মৃত্যুকে সরাতে থাকো। এই ভেবে বসুদেব বললেন – আমার সন্তানদের থেকেই তো তোমার মৃত্যু হবে, দেবকীর থেকে তো তোমার মৃত্যু হবে না, তবে তুমি কেন মিছিমিছি দেবকীকে হত্যা করবে। যখন যেমন যেমন দেবকীর সন্তান হবে সেই সন্তানকে তোমার হাতে তুলে দেব। বসুদেবের এই কথাটা কংসের মনঃপূত হওয়াতে মেনে নিল।

দেবকী আর বসুদেবকে জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছে। এই নিয়ে একজন মজা করে বলছিল – কংসটা সত্যিই একটা বোকা ছিল, যদি জেলেই রাখলে তাহলে দুজনকে এক ঘরে না রেখে আলাদা রাখলে তো সন্তানই আর হতো না, সব ঝামেল ওখানেই মিটে যেত। পরে ঋষিরা আবার কংসকে গিয়ে বলছে – দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানের হাতে তোমার মৃত্যু হবে বলছ, কিন্তু কোন দিক থেকে অষ্টম হবে সেই হিসাবটা কি করেছ? সামনের দিকে থেকে অষ্টম, না কি পেছন দিক থেকে অষ্টম? আসল ব্যাপার হল কংসের তখনও পাপ পরিপূর্ণ হয়নি, এখনও যদি কয়েকটা বাচ্চাকে হত্যা না করে দেয় কংসের পাপ পূর্ণ হবে না। এগুলোই পুরানের বিশেষত্ব। ইতিহাস আর পুরানের পার্থক্য এখানেই ধরা পড়ে। ইতিহাস সব সময় কাব্যকে আশ্রয় করে চলে। ঠিক ঠিক কাব্য বলতে একমাত্র বাল্মীকি রামায়ণকেই বোঝায়।

বাল্মীকি কখনই কোন চরিত্রকে পুরো সাদা বা সম্পূর্ণ কালো রঙে অঙ্কন করবেন না। পুরানে এসে এই ব্যাপারটাকে একেবারে পাল্টে দিয়ে হয় পুরোটাই সাদা নয়তো পুরোটাই কালো রঙে আঁকবেন। সেই কারণে পুরানকে কখনই সাহিত্য রূপে সম্মান দেওয়া হয় না। সাহিত্য বলতে বাল্মীকি রামায়ণ, এখানে শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যেও কিছু দুর্গুণ আছে আবার রাবণের মধ্যে কিছু ভালো গুণ আছে। পুরান যাঁকে ভগবান বানিয়ে দেবে তার মত আর ভালো লোক কেউ হবে না, আর তাঁর যিনি বিরোধী তার মত জঘন্য খারাপ লোক দুনিয়াতে আর কেউ নেই। কংসকে তার সাগরেদরা বোঝাচ্ছে তুমি যে দেবকী আর বসুদেবকে এক সঙ্গে কারাগারে রাখবে, আর এদের যে এক এক করে সন্তান হবে, তখন কোন সন্তান এক নম্বর, কে দুই নম্বর আর অষ্টম নম্বরের সন্তান তুমি বুঝবে কি করে; শুনে কংস ভয় পেয়ে ঠিক করে নিল প্রত্যেকটি সন্তানকেই আমি মারব। কিন্তু শুধু মারলেই হবে না, যতটা নৃশংস ভাবে মারা যেতে পারে দেখাতে হবে। পুরানের এটাই নিয়ম। বাল্মীকি রামায়ণে কোথাও বর্ণনা করে বলবে না যে রাবণ মানুষকে কেটে কেটে তার মাংস খাচ্ছে। এক জায়গায় রাবণ বলছে সীতা যদি সাত দিনের মধ্যে আমাকে বিবাহ করতে রাজী না হয় তাহলে ওকে কেটে ওর মাংস রান্না করে সকালে আমাকে খাইয়ে দেবে। এটা হল ভয় দেখানোর একটা কাব্যিক বর্ণনা। পুরানে কখন এই জিনিষ দাঁড়াবে না, সেখানে কুচি কুচি করে কাটার বর্ণনা করা হবে, অর্থাৎ যতটা কালো রঙ ঢালা যেতে পারে ঢালতে থাকবে, যাতে আমাদের মনে ঘৃণার ভাব জাগে। কংসও তাই বাচ্চাগুলো জন্মাচ্ছে আর এক এক করে দুম্ করে দেওয়ালে আছাড় দিয়ে মেরে ফেলছে। ভিলেনকে যতক্ষণ না কালো রঙ দিতে পারছে ততক্ষণ দৃশ্যটা জমবে না। বাল্মীকি এই জিনিষ কখনই করবেন না। এমনকি ব্যাসদেব তিনিও দুর্যোধন বা দুঃশাসনকে পুরো কালো রঙ দিচ্ছেন না, ধোঁয়াশে করে ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তিকালে এই চরিত্রগুলো নিয়ে যখন কিছু সাহিত্য রচনা করা হয়েছে সেখানে আবার পুরোটাই কালো রঙের করে ছেড়ে দিয়েছে। আসলে ব্যাসদেব বা বাল্মীকির মত সেই সাহিত্য প্রতিভা নেই। শ্রীকৃষ্ণের মত, শ্রীরামচন্দ্রের মত চরিত্রের মধ্যেও কিছু দোষের বর্ণনা করবেন অথচ তাঁকে মহাপুরুষ বা সুপারম্যানের পর্যায়ে নিয়ে যাবেন, এর জন্য বিরাট প্রতিভার দরকার। এই ক্ষমতা সব কবি বা সাহিত্যিকের থাকে না। নিউ ডিসকভারি বইতে এক জায়গায় আছে, পল ডয়সন যিনি এত বড় পণ্ডিত ছিলেন, উপনিষদের অনুবাদ করেছিলেন, যিনি কিছু দিন স্বামীজীর সঙ্গও করেছিলেন তিনিও স্বামীজীর কিছু ব্যাপারে নিন্দা করেছিলেন। যে পয়েন্টগুলো নিয়ে

তিনি নিন্দা করেছেন সেগুলোর ব্যাপারে কারোর আপত্তি নেই। কিন্তু নিন্দা করতে গিয়ে আরও দুচার কথা বাড়িয়ে নিজের তরফে লিখেছেন। সাধারণ মানুষ যখন মহাপুরুষদের খুব কাছ থেকে দেখে তখন তাঁদের কিছু কিছু ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ তাদের কাছে আপত্তিজনক মনে হতে পারে। যেমন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ঠাকুরের নামে বলছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবাহ করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গ না করে উপেক্ষা করেছেন, এটি তিনি অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের এই মন্তব্য শুনে পরে ম্যক্সমুলার প্রচণ্ড আপত্তি করে বলেছিলেন ব্রহ্মচর্য ধর্ম পালন ভারতবর্ষের উচ্চতম আদর্শ, এই উচ্চতম আদর্শকে নিয়ে প্রতাপচন্দ্রের নিন্দা করা কখনই উচিত নয়। যে কোন মহাপুরুষের কোন না কোন কিছুকে আশ্রয় করে নিন্দুকরা নিন্দা করার অনেক সুযোগ পেয়ে যাবে। কারণ পারফেকশান্ জিনিষটা কখনই কোথাও হয় না। যাঁরা খুব উচ্চমানের প্রতিভাবান সাহিত্যিক বা কবি তাঁরা ওই দোষ বা খুঁতটা দেখিয়েও তাঁকে মহাপুরুষের পর্যায়ে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন। এই ধরণের কবিদের থেকে যাঁরা একটু নীচের দিকে হন তাঁরা হয় পুরো সাদা নয়তো পুরোটাই কালো রঙে ছুপিয়ে দেবেন। পাঁচশ বছর পরেই হয়তো নাটক লেখা হবে যেখানে ঠাকুর, স্বামীজীকে বিরাট মহাপুরুষ বানাবার জন্য গিরিশ ঘোষ, কালিপদকে পুরোটাই কালো রঙে বর্ণনা করা হবে।

কংসকেও এই রকম এক জঘন্য নৃশংস পুরুষ তৈরী করতে হবে। দেবকীর যখন প্রথম সন্তানের জন্ম হল বসুদেব নিজে এসে কংসের হাতে দিয়ে গেলেন। কংস যতই হোক বসুদেব আর দেবকী তার কুটুম্ব, তারও একটু লজ্জা হল, এটা আমি কি করতে যাচ্ছি। কিন্তু ততক্ষণে তার মন্ত্রীরা তাকে উল্টো বুঝিয়ে দিল – আপনি এইসব একদম করতে যাবেন না, আপনি মরে গেলে আমাদেরও নাশ হয়ে যাবে। বড় নেতারা ভোটে হেরে গেলে সেই নেতার কোন সমস্যা হয় না, কিন্তু তার দলের যত ক্যাডারদের অবস্থা সর্বনাশ হয়ে যায়। রাজা মরে গেলে, কিংবা যুদ্ধে হেরে গেলে রাজার সাগরেদ্গুলিকেই আগে সবাই পিটিয়ে মেরে ফেলে।

কংসও এক এক করে দেবকী সন্তান জন্ম নিচ্ছে আর তাদের নৃশংস ভাবে বধ করে যাচ্ছে। ষষ্ঠ গর্ভের সন্তান মারা যাওয়ার পর যখন সপ্তম গর্ভ জন্ম নেবে তখন ভগবান শেষনাগ যাঁকে শ্রী অনন্তনাগ বলেও অভিহিত করা হয়, তাঁকে বললেন – এবার তুমি গিয়ে সপ্তম গর্ভে প্রবিষ্ট হও। ভাগবতের যত বড় বড় পণ্ডিত আছেন তাঁরা সবাই ভাগবতের উপর

কলম চালিয়ে নিজের নিজের ভাষ্য দিয়ে গেছেন। এখানেও ভাষ্যকাররা বলছেন, যিনি শেষনাগ তিনি বলছেন 'শ্রীরাম অবতারে আমাকে ছোটভাই লক্ষ্মণ হয়ে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল বলে শুধু জ্যেষ্ঠের আদেশ মেনেই সারা জীবন চলতে হয়েছে, এই অবতারে আমি ভগবানের দাদা হয়ে যাব, যার ফলে আমার সম্মানটাও বেশী হবে। ভগবান শেষনাগকে পাঠিয়ে দিলেন সপ্তম গর্ভে। অন্য দিকে ভগবান তাঁর যোগমায়াকে পাঠিয়ে দিলেন ব্রজপুরে বসুদেবের আরেক পত্নী রোহিনীর গর্ভে। এখানে লক্ষ্মীর কথা আসছে না, ঈশ্বরের যে মায়া শক্তি, সেই যোগমায়ার কথা বলা হচ্ছে, সেই যোগমায়াকে ভগবান বলছেন 'হে যোগমায়া, তুমি গোকুলে নন্দ বাবার ঘরে রোহিনীর গর্ভে জন্ম নাও, এদিকে দেবকীর গর্ভের আমার জন্ম হবে আর ওদিকে তোমার জন্ম হবে'। পরে অবশ্য দুজনের স্থান বদল করে নেওয়া হবে। তারপরে ভগবান যোগমায়াকে বলছেন 'এই যে আমাদের মধ্যে স্থান বদল হবে, তারপরে তোমার কাছে যে যা প্রার্থনা করবে, তুমি তার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করতে সক্ষম হবে। যারাই তোমাকে ভক্তি করবে তারা তোমাকে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি দিয়ে পূজা নিবেদন করবে আর *নামধেয়ানি কুর্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি। দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি।। কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ। মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকেতি চ।।১০/২/১১-১২*/তুমি আমার এই কার্যে সহায়তা করলে বলে পৃথিবীতে মানুষ তোমাকে বিভিন্ন স্থানে পীঠাদি স্থাপন করে দুর্গা, বিজয়া, ভদ্রকালী, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, সারদা, অম্বিকা প্রভৃতি নানা নামে তোমাকে আবাহন করবে। যদিও ভাগবত ভক্তিগ্রন্থ কিন্তু ঠিক ঠিক শক্তির বর্ণনা এখানেই এসে যাচ্ছে। তন্ত্রে যে শক্তির আরাধনার তত্ত্ব আছে সেটা এখানে পুরানে এসে মিলে গেল। যোগমায়াকে নিয়ে এসে তন্ত্রকে ভাগবতে মিলিয়ে দেওয়া হল।

এর ঠিক আগে বলছেন - শ্রীকৃষ্ণের ঠিক আগে দেবকীর গর্ভে যে সন্তান আছে, সেই গর্ভকে স্থানান্তরিত করা হবে রোহিনীর গর্ভে, আর তিনি বলরাম হয়ে সেখানে জন্ম নেবেন। এই গর্ভকে দেবকীর গর্ভ থেকে আকর্ষণ করে স্থানান্তরিত করা হবে বলে ওনার নাম হবে সঙ্কর্ষণ। এই ব্যাপারটা অনেকটা এখনকার টেস্ট টিউব বেবীর মত। আজকাল প্রায়ই শোনা যায় হাসপাতালে বাচ্চা বদল করে দেয়। কোন মায়ের ছেলে হয়েছে সেই বাচ্চাকে পাল্টে দিয়ে যার মেয়ে হয়েছে তার কাছে রেখে মেয়েটাকে যার ছেলে হয়েছে তার কাছে রেখে দেবে। লিঙ্গ

বদল, টেস্ট টিউব বেবী, বাচ্চা বদল সব কিছুর অভিজ্ঞতা সেই কালেই এনাদের হয়ে গেছিল। তাও কবে; যিশু খ্রীস্টের জন্মের অনেক আগে এগুলো লেখা হয়ে গেছে, তার মানে আরো কত আগে থেকে এসবের অভিজ্ঞতা তাঁদের হয়ে গেছে। এই ধরণের জিনিষ হতে পারে, কত আগে থাকতে এদের চিন্তায় ছিল, খুব আশ্চর্যের জিনিষ।

শেষে দেবকীর গর্ভে এখন ভগবান এসে গেছেন। ভগবান এখানে কিন্তু বসুদেবকে মাধ্যম করে এসেছেন। খ্রীশ্চান ট্রাডিশানে যেমন দিব্য আবির্ভাবের ধারণা নিয়ে আসা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে তা হয়নি, বসুদেবের শরীরের মাধ্যমেই এসেছেন। ভাগবতে এখানে খুব সুন্দর বর্ণনা করা হচ্ছে - *সা দেবকী সর্বজগন্নিবাসনিবাসভূতা নিতরাং ন রেজে। ভোজেন্দ্রগেহেহগ্নিশিখেব রুদ্ধা সরস্বতী জ্ঞানখলে যথা সতী।।১০/২/১৯।*

যিনি ভগবান, তিনি সারা জগতের নিবাসস্থান, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ভগবানেই বাস করে, সেই ভগবান এসে আশ্রয় নিয়েছেন দেবকীর গর্ভে অর্থাৎ দেবকীই এখন সেই ভগবানের নিবাসস্থান, এটাই আশ্চর্য। মানুষের মনে বিরাটের একটা কল্পনার ছবি ফুটিয়ে তোলার জন্য এই ধরণের কাব্যিক বর্ণনা করা হয়। টেবিলের উপর একটা গ্লাশ আছে, গ্লাশটা বাতাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সেই বাতাস আবার গ্লাশের মধ্যেও আছে। গ্লাশের ভেতরের বাতাস আর বাইরের বাতাসের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। ঠিক তেমনি পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আকাশতত্ত্ব আছে। সেই আকাশতত্ত্বের মধ্যেই এই গ্লাশ বিদ্যমান, গ্লাশটাও আকাশতত্ত্ব আর এই গ্লাশের মধ্যে যা আছে সেটাও আকাশতত্ত্ব। একদিকে যিনি ভগবান তাঁর মধ্যে সমগ্র জগৎ বিরাজমান, তিনিই আবার দেবকীর গর্ভে আশ্রয় নিয়েছেন। ভগবানের অবতারতত্ত্ব ঠিক এইভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু আমার আপনার ক্ষেত্রে হবে ভগবান ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ রূপে বিরাজ করছেন। অন্যান্য অবতারের ক্ষেত্রে কখন কলা কখন অংশ বলা হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে ভগবান নিজে, মানে পূর্ণাবতার।

এখানে 'জ্ঞানখল' শব্দ ব্যবহার যেটা করছে, তার অর্থ হচ্ছে যারা একটা কিছু জানেন অথচ সেটা প্রকাশ করবে না। বিহারে দেখা যায় কেউ হয়তো খুব খেটেখুটে একটা গাড়ি কিনল, গাড়ি কেনার পর গাড়িতে কত রকমের লাইট লাগাবে, ব্রেক মারলে এক রকম আলো জ্বলবে, চললে এক রকম আলো, দাঁড়িয়ে থাকলে এক রকম আলো, কত ঝকমকানি, আর

কত রকমের মিউজিক, এক কিলো মিটার দূর থেকেই বুঝতে পারবেন ওর গাড়িটা আসছে। কিন্তু যারা সত্যিকারের বড়লোক, প্রত্যেক বছর পুরনো গাড়ি বেচে দিয়ে নতুন গাড়ি কেনে, তাদের গাড়িতে এইসব পাঁয়তারা কিছু দেখতে পাওয়া যাবে না। এই বড়লোকেরা হচ্ছে টাকাখল। তাদের কাছে যে টাকা আছে সেটাকে ঢেকে রেখে দিয়েছে। জ্ঞানখল হচ্ছে ঠিক তাই। একটু যাদের বিদ্যা বুদ্ধি আছে সে চারিদিকে ফরর্ ফরর্ করে দেখিয়ে বেড়াবে। সে বিজ্ঞান নিয়েও বলছে, রাজনীতি নিয়েও বলছে, শাস্ত্র নিয়েও বলছে, সব বিষয়ে নিজেকে জাহির করে বেড়াবে। কিন্তু যাঁরা প্রকৃত জ্ঞানী, যাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিদ্যা থাকে তাঁরা কখন মুখ খুলবেনই না, তাঁরা জ্ঞানখল হয়ে যান। এটাকেই বলা হয় জ্ঞানখল, জ্ঞান যেটা ভেতরে আছে সেটাকে ঢেকে রাখে, কখনই প্রকাশ হতে দেন না। যেমন মৌচাকে মধু থাকে, সেটাকে বাইরে থেকে বোঝা যায়না, কিন্তু একটা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে একটু খোঁচা দিলে টপ্ টপ্ করে মধু ঝড়তে থাকে। জ্ঞানখলের এই ভাবটা ভাগবতের একটা খুব অন্যন্য এবং উল্লেখনীয় ভাবধারা।

বলছেন দেবকি হলেন ঠিক ঠিক জ্ঞানখল। তাঁর গর্ভে সাক্ষাৎ নারায়ণ রয়েছেন, কিন্তু তাঁর মুখের, শরীরের কোন রকমের পরিবর্তন হল না। দেবকীর মধ্যে এমনই শক্তি যে সে পুরোটাকে ঢেকে দিয়ে জ্ঞানখল হয়ে গেছে। শ্রেষ্ঠ বিদ্যাটাকে নিজের ভেতরে রেখে চাপা দিয়ে দেয়, বাইরের কারোকে বুঝতে দেয় না। যেমন একটা কুঁজোর মধ্যে যদি একটা দীপ জ্বালিয়ে রেখে দেওয়া হয় তখন দীপের আলো বাইরে যায় না। কিন্তু কুঁজোর বদলে যদি কোন কাঁচের আবরণের মধ্যে দীপটা রাখা হয় তখন পুরো আলোটাই ছড়িয়ে পড়ে।

আর সেই সময় ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্য দেবতারা কংসের কারাগারে উপস্থিত হয়ে ভগবানের স্তুতি করতে শুরু করেছেন। *সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতং চ সত্যে। সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ।।১০/২/২৬।* বলছেন – হে প্রভু আপনি হচ্ছেন সত্য সঙ্কল্প, মানে আপনি যেটা ভাবেন সেটাই হয়। সেই কারণে সত্যই হচ্ছে আপনাকে প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই ত্রিবিধ অসত্য অবস্থার মধ্যেও আপনি সত্যরূপেই বিরাজমান। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম এই পঞ্চভূতের মধ্যে অন্তর্যামী রূপে অবস্থিত বলেই এই দৃশ্যমান জগৎ সত্য রূপে প্রতিভাসিত। আপনিই সত্যস্বরূপ। আমরাও বলি ঠাকুর হলেন

সত্যস্বরূপ। ঠাকুর বারবার বলছেন সত্যই কলির তপস্যা। ঠাকুরের এই কথা ভাগবতেই বলা হয়েছে সত্য থেকেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। ঠাকুরের যখন সত্যের আঁট ছিল তখন এমন ছিল তিনি যেটা বলবেন সেটা তাঁকে করতেই হবে, যদি বলতেন ঝাউতলায় যাবো, বাহ্যে নাও পেলে একবার ঘুরে আসবেন। কিন্তু কোন কোন সময় তিনিও ব্যবহারে সত্যের আঁট রাখেননি। বিয়ের সময় শ্রীশ্রীমাকে পাড়ার লোকেদের কাছ থেকে গয়না ধার করে এনে পড়াতে হয়েছিল। মায়ের বাড়ির লোকরা জানতেন এই গয়নাগুলো শ্রীশ্রীমায়ের শ্বশুড় বাড়ীরই। বিয়ের পর সেই গয়না ফেরত দিতে হবে তখন মায়ের শরীর থেকে সেই গয়না ঠাকুর নিজেই খুলেছিলেন। মায়ের বাড়ির লোকেরা বুঝে গেছেন সব গয়না ধার করা। ওনারা যখন রেগেমেগে শ্রীমাকে জয়রামবাটিতে নিয়ে চলে গেলেন, তখন ঠাকুর বলছেন 'নিয়ে যাক না তাতে কি হয়েছে, বিয়েতো আর ফেরত নিয়ে যেতে পারবে না'। মহাভারতে বলছে বিয়ের সময় মিথ্যে কথা বলা চলে, ঠাকুর এটা করে দেখালেন। কিভাবে, বিয়ের সময় এগুলো করে, বলে, হ্যাঁ আমার প্রচুর টাকা পয়সা গয়না আছে। শ্রীমায়ের জন্য গয়না ধার নিয়ে এলো, কোনটাই তাদের নয়। আবার দেখুন ঠাকুরের কাছে কামারপুকুরের মেয়েরা দুপুরে ঈশ্বরীয় লীলার কথা, গান শুনতে আসত। বাড়ির লোকেরা আপত্তি করতে পারে, তাই ঠাকুর তাদের শিখিয়ে দিলেন মেলার নাম করে এখানে আসবে, দুই পয়সা দিয়ে মেলা থেকে হাড়ি কিনবে আর এখানে চলে আসবে। ঠাকুরের যখন সত্যের আঁট ছিল তখন এক রকম, কিন্তু ঐ আঁট নিয়ে জগত চলে না। সেইজন্য হচ্ছে সত্য সঙ্কল্প, সত্য সঙ্কল্প মানে – আমি যেটা সঙ্কল্প করলাম সেটাই হবে। ঠাকুর বলছেন মন মুখ এক কর। আবার বলছেন সংসারে সব কাজ করবে কিন্তু জানবে এরা আমার কেউ নয়, এমন ভাবে করবে সবাই যেন ভাবে এরা আমার নিজের লোক। এখানে মন আর মুখতো এক হল না। এগুলোই ধর্মের সূক্ষ্ম গতি।

শ্রীকৃষ্ণ এখনো গর্ভে আছেন, এখনো তাঁর জন্ম হয়নি। স্তুতি করে দেবতাদিরা বলছেন – আপনি হলেন মধুর বাণী আর সমদর্শনের প্রবর্তক – মানে মিষ্টি ভাবে কথা বলতে হয়, সমান ভাবে সবাইকে দেখতে হয়, কারুর প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন হতে নেই। এটাই আপনি করান। আর এই সংসার কি, *একায়নোঽসৌ দ্বিফলস্ত্রিমূলশ্চতূরসঃ পঞ্চবিধঃ ষড়াত্মা। সপ্তত্বগষ্টবিটপো নবাক্ষো দশচ্ছদী দ্বিখগো হ্যাদিবৃক্ষঃ।।১০/২/২৭।* এই যে সংসার, এটি এক সনাতন বৃক্ষ, ঊর্দ্ধমূলম্ অধঃশাখম্, এই বৃক্ষের আশ্রয় এক, মানে প্রকৃতি – মূলটাই

প্রকৃতি। এই বৃক্ষের ফল দুটি –সুখ আর দুঃখ। শেকড় তিনটি – সত্ত্ব, রজ ও তম। রস চারটি – ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। একে জানার পথ পাঁচ রকম – এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে। এর স্বভাব ছয় রকমের – জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, ক্ষয় এবং বিনাশ। রস, রুধির, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র এই সাতটি ধাতু বৃক্ষের বল্কল, পঞ্চ মহাভূত এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার বৃক্ষের আটটি শাখা, বৃক্ষের নয়টি কোটর মুখ, কান, নাক, চোখ ইত্যাদি যেগুলিকে নবদ্বার বলা হয়। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত এবং ধনঞ্জয় এই দশটি প্রাণ বৃক্ষের দশটি পাতা। এই সংসাররূপ সনাতন বৃক্ষে দুটি পাখি বাস করে – জীব আর পরমাত্মা। হে প্রভু! এই সংসাররূপ বৃক্ষের উৎপত্তির একমাত্র কারণ আপনিই, আর আপনারই অনুগ্রহে এর স্থিতি বা রক্ষা হয়। এইভাবে ব্রহ্মা, শিব ও সমস্ত দেবতারা সাক্ষাৎ ভগবানের স্তুতি করে যাচ্ছেন। এগুলো আর কিছুই না, ঈশ্বরকে কত ভাবে কল্পনা করা যেতে পারে তারই একটু ঝলক।

বল্লভাচার্য ভক্তিশাস্ত্রে একজন খুব নামকরা দ্বৈতবাদী সাধু ছিলেন। মাধ্বাচার্যরা হলেন এই বল্লভাচার্যেরই পরম্পরা। বল্লাভাচার্য থেকে শুরু করে মাধ্বাচার্যের মত ভাগবত পণ্ডিতরা বলেন ভাগবত পুরানের প্রত্যেকটি শ্লোকের পনেরো থেকে কুড়িটা আলাদা অর্থ করা যায়। এমনিতেই ভাগবতের শ্লোক এত দুর্বোধ্য যে ভাষ্য ছাড়া সংস্কৃতের বড় বড় পণ্ডিতরাও শ্লোকের অর্থ বুঝতে পারেন না। সেইজন্য পণ্ডিত বলতে ভাগবত পণ্ডিতকেই বোঝায়। ভাগবতের সব থেকে বড় ভাষ্যকার হলেন বল্লভাচার্য। এই অধ্যায়কে পণ্ডিতরা শ্রীকৃষ্ণের জন্ম না বলে বলেন প্রাকট্য। গীতা বা মহাভারতেও বলা হয়েছে যে, ভগবান কখনই জন্ম গ্রহণ করেন না, তিনি প্রকট হন। হিন্দুদের অবতারতত্ত্বকে যাঁরা সমালোচনা করেন তাঁরা কিছুতেই এই জায়গাটা বুঝতে পারেন না যে, ভগবানের কখন জন্ম হয় না। মজার ব্যাপার হল অন্য ধর্মে ভগবান কখন জন্ম নেন না। যেমন ইসলামে কেউ যদি বলে আল্লা জন্ম নিলেন তাহলে সে খুব বিপদ পড়ে যাবে। ইসলামে এই জিনিষ হতেই পারে না। সেইজন্য মহম্মদকে বলতে হল আমি হলাম পয়গম্বর, আমি আল্লার কথা বলছি। খ্রীশ্চান ধর্মে যিশুকেও বলতে হচ্ছে (Son of God) আমি ঈশ্বরের পুত্র। অনেকে বলেন পিতা পুত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। ঠিক কথাই বলছেন, কিন্তু তিনি ভগবান নন। হিন্দুধর্মে বলছে ভগবান, কিন্তু ভগবানের জন্ম হতে পারে না। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে ভগবান বলছি, বলার

সময় ঠিকই বলা হচ্ছে, এতে কোন ভুল নেই। কিন্তু তার সাথে এটাও বলতে হবে – যিনি ভগবান তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ রূপ দেহকে আশ্রয় করে আমাদের সামনে বিরাজ করছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে খুব সহজ কথা, কিন্তু তত্ত্বতঃ খুব কঠিন কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান নন, যিনি ভগবান তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ, এই ব্যাপারটা একবার যদি আমাদের পরিষ্কার হয়ে যায় তখন অবতারতত্ত্ব, দ্বৈত, অদ্বৈত তত্ত্ব এগুলো পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

আমি কে? আমি অমুক নামধারি একজন ব্যক্তি, আমার অমুক দিনে জন্ম। যিনি দেহধর রামকৃষ্ণ তাঁর জন্ম হয়েছে, কিন্তু এই জন্মটা ভগবানের জন্ম নয়। কারণ জন্ম তারই হবে যে সীমিত। যে কোন পদার্থের ছয় রকমের বিকার হবে, যাকে বলা হয় ষড়বিকার। ষড়বিকারের প্রথমটাই হল জায়তে। তার মানে, যার জন্ম হবে তার মধ্যে বাকি পাঁচটি বিকার থাকবে। যার জন্ম হবে তারই বৃদ্ধি হবে, তারই ক্ষয় হবে আর তারই একদিন বিনাশ হবে। ভগবান যদি জন্ম নিয়ে থাকেন তাহলে ভগবান বড় হবেন, ভগবানের ক্ষয়ও হবে আর একদিন ভগবানেরও নাশ হবে। ভগবানের যদি নাশ হয় তাহলে তিনি আর কি করে ভগবান হবেন! সেইজন্য বলছেন ভগবানের কখন জন্ম হয় না। গীতাতেও একই কথা বলা হয়েছে– জন্ম কর্ম চ মে দিব্যং এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ, এখানে তত্ত্বতঃ শব্দটাই গুরুত্বপূর্ণ। এনারা জানতেন ভগবানের জন্ম হয় না, কিন্তু যে জন্মটা আমরা দেখছি এই জন্ম হল দিব্য জন্ম। দিব্য জন্ম মানে তিনি আবির্ভূত হন। আমার আপনার ক্ষেত্রে বলা হবে না যে আমি আবির্ভূত হয়েছি। কারণ তিনি সর্বকালে, সর্বব্যাপী, সর্বস্থানে, সর্বদা বিরাজমান, তাঁর আবার জন্ম কি করে হবে! শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম নিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ মারা গেলেন বললে বলতে হয় ভগবান জন্ম নিলেন আবার ভগবান মারা গেলেন, এর থেকে হাসির কথা কি হতে পারে! এই জিনিষ দ্বৈতেও দাঁড়াবে না, অদ্বৈতে তো দাঁড়াবেই না। আচার্য শঙ্কর তাই বলছে *দেহবানিব জাত ইত চ লোকনুগ্রহং কুর্বন্ লক্ষ্যতে।* আচার্য শঙ্কর, যিনি অদ্বৈত বেদান্তের সব থেকে বড় ভাষ্যকার, তিনি বলছেন ভগবান জন্ম নিয়েছেন, কিন্তু *দেহবানিব জাত,* যেন দেহবান হলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভগবান অর্জুনের রথ চালনা করছেন। রথের বাইরে কে আছেন? রথের বাইরেও যদি ভগবানই থাকেন তাহলে ভগবান কি করে অর্জুনের রথ চালাবেন? ঠিক এই কারণেই বলা হয় *দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।* আমার মায়া অত্যন্ত গুণময়ী, এই মায়া সবার মাথা একেবারে গুলিয়ে রেখে দেয়। যতই আমরা গীতা, ভাগবত পড়ি, কিছুতেই এই

জিনিষটা তর্ক করে, যুক্তি দিয়ে দাঁড় করান যাবে না, এখানেই সবাইকে উল্টে ফেলে দেবে। আচার্য নিজে একজন অদ্বৈতী হয়ে বলছেন ভগবান দেবকীর গর্ভে জন্ম নিচ্ছেন। ভগবানের কি কখন জন্ম হয়? কখনই হয় না, সেইজন্য আচার্য বলছেন *দেহবানিব জাত*, যেন তিনি জন্ম নিচ্ছেন। সেইজন্য ভগবানের জন্মেকে কখন জন্ম বলা হয় না। জন্ম নিচ্ছেন না বলে বলা হয় আবির্ভূত হচ্ছেন। ভগবান আবির্ভূত হচ্ছেন এটা হল প্রথম দিক, দ্বিতীয় দিক হল সমস্ত কিছু পবিত্র, শুদ্ধ ও শুভ হয়ে যায়। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন রাজা যদি কোন কর্মচারীর উপর প্রসন্ন হয়ে বলেন আমি তোর বাড়ি যাব। রাজা জানে সেই লোকটির ক্ষমতা নেই রাজাকে রাজকীয় ভাবে আপ্যায়ন করার। সেইজন্য রাজা নিজের লোক আগে থাকতে পাঠিয়ে দেন ঘরদোর সব পরিষ্কার করতে, ভালো কার্পেট বিছিয়ে দেবে, ভালো আসবাব, রূপোর গড়গরা আগে থাকতে পাঠিয়ে দেবে, রাস্থাঘাট সব সাফসুতরো করার জন্য লোক পাঠিয়ে দেবে। সব রাজার বাড়ি থেকেই যাচ্ছে। আমার আপনার কি ক্ষমতা আছে আমাদের কাম, ক্রোধ রিপুগুলো জয় করার? আমাদের সাধ্যই নেই। তিনি যখন কারুকে কৃপা করেন তখন তিনি তাঁর ঐশ্বর্য পাঠিয়ে দেন। অর্থাৎ তার মধ্যে ভগবানের দৈবী সম্পদ আসতে শুরু হয়ে যায়।

ভগবানের আবির্ভাবের জন্য এগুলোই হল প্রস্তুতি। ভগবান যখন সশরীরে এই জগতে আবির্ভূত হবেন তখন তিনি কি করেন? আমাদের বিভিন্ন শাস্ত্রে জগতের যে নয়টি তত্ত্বের কথা বলা হয়, প্রথমে পাঁচটি তত্ত্ব, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও বায়ু তার আগে কাল ও দিশা এবং শেষে ও আত্মা এই নটি তত্ত্ব। যে কোন জীব এই নটি তত্ত্বের মধ্যে বাধা আছে। ভগবানের আবির্ভাবের পূর্বে এই নটি তত্ত্ব শুদ্ধ পবিত্র রূপ ধারণ করে। তন্ত্রশাস্ত্রে বলছে ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, সেই অভেদত্ব ভেদ করে শক্তি কালী রূপে দেখা দেন, কালী থেকে মহাকালের জন্ম, মহাকাল থেকে কালের আবির্ভাব। কালের আবির্ভাব হয়ে যাওয়া মানে এবার সৃষ্টি পুরোদমে শুরু হয়ে গেল। কাল হল measure of events। Measure of events হওয়া মানেই সৃষ্টি শুরু। সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের এই গূঢ় তত্ত্ব কথাগুলো ধরতে পারে না। সেইজন্য জন্মাষ্টমি, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এই শব্দগুলো বলা হয়। কিন্তু যাঁরা সত্যিকারের ভাগবত পণ্ডিত তাঁরা কখনই ভাগবতগ্রন্থ পাঠ করার সময় বলবেন না শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, বলবেন শ্রীকৃষ্ণের প্রাকট্য, তিনি প্রকট হয়েছেন। ভগবান সব সময় সর্বত্র বিরাজমান, তাঁর জন্ম কি করে হবে? কিন্তু তিনি হঠাৎ করে এই রূপে প্রকট হয়ে গেলেন। এই রূপে প্রকট হতে গেলে তাঁর দরকার

একটা মায়ের গর্ভ। কিন্তু এর আগে যে তাঁর অস্তিত্ব ছিল না, তা নয়। অন্যান্য ধর্মে যিনি অনন্ত তিনি আবার সান্ত হতে পারেন এই ব্যাপারটাকে ধরতেই পারে না। ইসলামে ঈশ্বরের জন্ম নেই, অবতারতত্ত্ব নেই তাই অন্য ধর্মের এই জিনিষগুলো তারা কিছুতেই মানবে না। খ্রীশ্চান ধর্মে ঈশ্বরের অবতারত্বকে সন্তান রূপে নেবে কিন্তু সরাসরি ঈশ্বর আসবেন কখনই মানবে না। কিন্তু হিন্দুদের কাছে ভগবান হলেন অসীম ক্ষমতাবান তিনি যেখানে খুশী যখন খুশী প্রকট হয়ে যেতে পারেন। ভাগবতের তিনটে শ্লোকে এই ভগবানের যেখানে খুশী প্রকট হওয়ার ব্যাপারটাকে খুব সহজ ভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। এই তিনটে শ্লোক থেকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা শুরু হয়।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় এসে গেছে। পরীক্ষিৎকে শুকদেব বলছেন *অথ সর্বগুণোপেতঃ কালঃ পরমশোভনঃ। যর্হ্যেবাজনজন্মর্ক্ষং শান্তর্ক্ষগ্রহতারকম্।। দিশঃ প্রেসেদুর্গগনং নির্মলোড়ুগণোদয়ম্। মহী মঙ্গলভূয়িষ্ঠপুরগ্রামব্রজাকরা।। নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা হ্রদা জলরুহশ্রিয়ঃ। দ্বিজালিকুলসংনাদস্তবকা বনরাজয়ঃ।।১০/৩/১-৩।* হে পরীক্ষিত, এরপর সর্বগুণযুক্ত পরম রমণীয় কাল আবির্ভূত হল। ভগবান যে মুহুর্তে জন্ম নিতে যাচ্ছেন, সেই মুহুর্তের সময়টা অত শুভক্ষণ। কি শুভ, যত রকমের শুভ গুণ, ভালো গুণ হতে পারে সব গুণ এক সঙ্গে এসে হাজির হয়ে গেছে। সেই সময়ের নক্ষত্র রোহিণী, আর যত গ্রহ, নক্ষত্র, তারা সব শান্ত ও সৌম্য রূপ ধারণ করল, কোথাও কোন ধরণের উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব নেই। দিশাগুলি সব স্বচ্ছ ও প্রসন্ন, আকাশ নির্মল, পরিষ্কার, তারাগুলো ঝকমক করছে। পৃথিবীর সব কিছু, যত ছোট বড় গ্রাম, গঞ্জ, ব্রজভূমি, খনি আদি আকরস্থান সব যেন শান্ত ও শুভ ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে মঙ্গলময় রূপ ধারণ করেছে। সমস্ত নদী নির্মল ও পবিত্র জলে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, যদিও তখন রাত্রি কিন্তু নদীতে, জলাশয়গুলিতে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। জঙ্গলে যত বৃক্ষাদি ছিল তাতে তক্ষুনি ফুল ফুটে গেল। যদিও রাত তবুও পাখিদের কুজনে আর ভ্রমরের গুঞ্জনে রাত্রির পরিমণ্ডল গুঞ্জরিত হয়ে উঠল।

এই যে তিনটে শ্লোকের মূল ভাব হল, ভগবানের আবির্ভাবে পৃথিবী, আকাশ, দিশা, প্রকৃতির সব কিছু নির্মল হয়ে গেছে। এই তিনটে শ্লোক খুবই সাধারণ শ্লোক, কিন্তু ভাষ্যকারদের ভাষ্য সহকারে পাঠ করলে মন যে কখন কিভাবে কত গভীরে ভেতরে নিয়ে

চলে যায়, বোঝা যায় না। ভাগবতের ভাষ্যকাররা কেউ কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন না, এনারা সবাই ঋষি, ধ্যানের গভীরে যাঁরা সব সময় ডুবে থাকেন, তাঁরা এই তিন-চারটে শ্লোকের কিভাবে ব্যাখ্যা করছেন আমরা দেখব। যেমন এক জায়গায় বলছেন – যখন অন্তঃকরণ শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যায় তখন সেই অন্তঃকরণে ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়। ধ্যান করতে করতে সমস্ত বৃত্তির নাশ হতে হতে যোগীর অন্তঃকরণ যখন শুদ্ধ হয়ে যায় তখন সেই শুদ্ধ মনের দ্বারা যোগীর ঈশ্বরের দর্শন হয়। যোগীদের হৃদয়ে যেভাবে ঈশ্বরের আবির্ভাবের কথা বলা হল এটা হল ব্যষ্টি। সমষ্টিতেও ঠিক সেটাই দরকার। ভগবানের দুটো রূপ – একটা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যিনি আছেন, যাঁকে আমরা শুদ্ধ হৃদয়ে দর্শন করি। আরেকটি রূপ হল যিনি স্বয়ং ভগবান তিনি এবার প্রাকট্য হবেন। ভগবান এবার শ্রীকৃষ্ণ রূপে এই পৃথিবীতে আবির্ভুত হতে যাচ্ছেন, ভগবানকে এবার মানুষ রূপে দেখা যাবে। কিন্তু ভগবান যখন তখন যেখানে সেখানে যেভাবে সেভাবে আসবেন না। তিনি যেখানে আসবেন সেখানকার সমষ্টি মণ্ডলকেও শুদ্ধ, পবিত্র, নির্মল হতে হবে। তাই যোগীদের মনের মত পৃথিবী ও তার সমষ্টি প্রকৃতির শুদ্ধির অবস্থার বর্ণনা করা হচ্ছে। অন্তঃকরণ, মন যেমন শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যায় ঠিক বহিঃপ্রকৃতিও শুদ্ধ হয়ে গেল ভগবানের আবির্ভাবের জন্য। প্রকৃতির মধ্যে কি কি আছে – কাল, দিশা, পঞ্চ মহাভূত, মন, আত্মা, এই নয়টি হচ্ছে দ্রব্য। এই নয়টি দ্রব্যের এক একটির নাম করে বলা হয়েছে এরা সবাই খুব শুদ্ধ ও পবিত্র হল।

কাল শুভগুণ সম্পন্ন হল। কাল নিজেকে মনে করে আমি সবার উপরে, কারণ কাল ব্রহ্মাকেও খেয়ে নেয়। কিন্তু কাল কোথাও শুনেছে ভগবান নাকি তারও উপরে, ভগবান নাকি কালাতীত। অন্যান্য ধর্মেও ঠিক একেই কথা বলছে। ভগবান সব সময় স্থান, কাল ও কার্যের বাইরে। তবে হিন্দুধর্মে ভগবান যে কালেরও পারে এটাকে খুব নাটকীয়ভাবে বলা হয়। কাল সব কিছুকে গ্রাস করে নেয়। কাল যখন জানতে পারল শাস্ত্রে বলে ভগবান নাকি কালেরও পারে এই কথা শোনার পর কাল নাকি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি সব কিছুকে নাশ করি আর এরা বলছে আমার উপরেও কেউ একজন আছে। তখন কাল ক্রুদ্ধ হয়ে রুদ্র রূপ ধারণ করে সংহার করে বেড়ায়। এগুলি আর কিছুই নয়, কবির কল্পনা। এখন যখন কাল জানতে পারল ভগবান দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ রূপ মানব দেহ ধারণ করে আমারই অধীনে

আসছেন, তখন তার আনন্দ আর কে দেখে! কথাই আছে পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে। একবার যখন মায়ার জগতে ঢুকে যাবেন তখন সবাইকেই মায়ার অধীনে চলে আসতে হবে। ঠাকুরও বলছেন অবতারও শক্তির আণ্ডারে। এবার ভগবান যা কিছুই করবেন তাঁকে কালের মধ্যেই করতে হবে। সবাই বলবে ভগবান পাঁচ বছর বয়সে এই করেছিলেন, দশ বছরে এই করেছিলেন, এখন সব কিছু কালের মধ্যে গণনা করা হবে। এই খবর জানার পর থেকে তাই কাল বিরাট খুশী হয়ে গেছে, আনন্দে সে ভরে গেছে। আবার যখন কাল ভাবলো সেই ভগবান তিনিও আমাকে স্বীকার করতে যাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে কাল নরম হয়ে গেল।

দিশা মানে দিক, যত দিশা আছে তারাও ভগবানের আবির্ভাবের পূর্বে খুশীতে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। দিশারা কেন আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছে, বলে নাকি, কংসের অত্যাচারে দিশাদের সব স্বামীরা বন্দী হয়েছিল। ভগবান যখন এসে যাচ্ছেন তখন সবারই মুক্তি হয়ে যাবে। দিশারা তাই আনন্দিত, আবার আমাদের স্বামীদের সাথে মিলন হবে। দ্বিতীয় কথা, সংস্কৃতে দিশার আরেকটি অর্থ আশা। যত সৎ পুরুষ আছেন, তাঁদের অভিলাষা এবার পূর্ণ হতে চলেছে, তাঁদের তো একটিই আশা, সর্বগুণসম্পন্ন সর্বাধার সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাকার রূপ দর্শন। বেদের পুরুষসুক্তমে যে বিরাট পুরুষের বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে দিশাকে সেই বিরাটের কর্ণ বলা হচ্ছে। তার মানে, দিক হল ভগবানের কান। এই জিনিষগুলিকে খুব আক্ষরিক ভাবে নিতে নেই, এগুলো মূলতঃ ধ্যানের জন্য। দিশারা তাই এখন খুব আনন্দিত, কারণ তারা ভগবানের কান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে এবার অনেক দুঃখী, নিপীড়িত মানুষ এসে নানান ধরণের অভিযোগ অনুযোগ করবে, আমাকে সে খুব অত্যাচার করেছিল, আমাকে সে খুব অপমান করেছিল ইত্যাদি বলে। ভগবান এবার সব দুষ্ট লোকদের শেষ করবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে যে দুখীদের কথাগুলো আসবে তাদের সব কথাই প্রথমে কান দিয়ে আসবে। ভগবানের লীলা শুরু হওয়ার আগে প্রথম যে তথ্য যাবে তা কান দিয়ে যাবে। এই ভেবে দিশারা তাই সবাই খুব আনন্দিত।

তারপরে বলছেন পৃথিবী শান্ত হয়ে গেছে আর খুব আনন্দে পৃথিবীর বুক ভরে উঠেছে এই ভেবে যে তার কত সৌভাগ্য হবে ভগবানের শ্রীচরণ আমার বুকের উপরে এসে পড়বে। পৃথিবীর আশ্রয় ভগবান নিজে কিন্তু এবার ভগবানের পা আমার বুকে পড়বে। আরেকটা ভাষ্যে বলছেন – বামন অবতারে তিনি ছিলেন ব্রহ্মচারী, কোন কিছুর সঙ্গে ওনার সম্পর্ক ছিল

না। পরশুরামের অবতারে তাঁর যা কিছু ছিল সব ব্রাহ্মণদের দান করে দিয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্রের অবতারের ভগবান পৃথিবীর যে মেয়ে তাকে বিয়ে করে নিলেন, তার মানে পৃথিবী হয়ে গেল ভগবানের শাশুড়ী। এই সব কারণে পৃথিবী কোন অবতারেই ঈশ্বর সান্নিধ্যের আনন্দটা ঠিক ভাবে উপভোগ করতে পারেনি। এইবারে শ্রীকৃষ্ণের অবতারে পৃথিবী আনন্দ পাবে, কেননা এই অবতারে শ্রীকৃষ্ণের সাথে লীলা খেলা করার এক দুর্লভ সুযোগ পৃথিবীর কাছে এসে হাজির হচ্ছে। এগুলো সবই ভাষ্য। সহজ কথা হল, ভগবান যখন আসেন তখন সব কিছ শুভ হয়ে যায়। মানুষের ভেতরে যে ভক্তিরসের আবেগ, ঈশ্বরের প্রতি অনাবিল ভালোবাসা আছে, সেগুলো যাবে কোথায়, সেই ভালোবাসাকে এইভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে।

নদী গুলোর কেন আনন্দ হয়েছে? ভগবান যখন শ্রীরামচন্দ্র হয়ে এসেছিলেন তখন তিনি পাহাড়কে তুলে সেতু বন্ধ করেছিলেন। পাহাড় হল নদীদের বাপের বাড়ি। আর সমুদ্র নদীদের শ্বশুড় বাড়ি। গঙ্গার জন্ম পাহাড়ে আর তার শেষ হচ্ছে সমুদ্রে, সমুদ্র হয়ে গেল তার শ্বশুড় বাড়ি। নদী ভাবছে শ্রীরামচন্দ্র আমার বাবাকে তুলে আমার শ্বশুড় বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে, কি আনন্দের কথা, শ্রীরামচন্দ্র কত কি করেছেন। যিনি আমাদের বাপের বাড়িকে শ্বশুড় বাড়িতে এনে রেখেছেন তাঁর আগমনে আমাদের আনন্দ হবারই কথা। এগুলো ভারতীয় মানসিকতার একটা বিচিত্র রূপ। গ্রামে গঞ্জে যখন ভাগবত কথা হয় সেখানে বেশীর ভাগ মেয়েরাই শ্রোতা হয়ে গিয়ে বসে। যখন ভাগবত কথাকার তত্ত্ব আলোচনা করবেন, সত্ত্ব, রজ ও তম বা পঞ্চ তন্মাত্রের কথা বলবেন তখন এরা ফিসফিস করে বলবে 'কি বলছেরে বাবা'। কিন্তু যখন, নদীর শ্বশুড় বাড়ি, পৃথিবীর লীলা করবার বাসনা আলোচনা হবে তখন বলবে, এটাই ঠিক ঠিক ধর্ম আলোচনা। ভগবানের কি কাজ শ্বশুড় বাড়ি আর বাপের বাড়ি এক করে দেওয়া? এবার মনে হবে ভগবান সত্যিকারের একজন ক্ষমতাবান।

হ্রদ মানে বড় বড় যত জলাশয় আছে সবাই খুব খুশীতে ডগমগ হয়ে গেছে। কেন খুশীতে ভরপুর হয়ে গেছে? বলছেন শ্রীকৃষ্ণ যখন কালীয়দমন করতে জলাশয় নামবেন তখন ভগবানের চরণ তাঁদের উপর স্থাপন করবেন। শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শে আমরা ধন্য হয়ে যাব। শ্রীকৃষ্ণকে তারা সবাই কি ভাবে পূজা করবে? তাদের হৃদয়ের পদ্মফুলকে জলে প্রস্ফুটিত করে জলাশয়গুলিকে পদ্মফুলে আচ্ছাদিত করে দেবে।

অগ্নি কিভাবে খুশী হল, কংসের অত্যাচারে ব্রাহ্মণরা সব যজ্ঞ বন্ধ করতে বাধ্য হয়ে গিয়েছিল। পৌরানিক কাহিনীর এটা একটি বৈশিষ্ট্য যে, যখনই আসুরিক শক্তি প্রাদুর্ভাব হবে তখনই তারা সমস্ত রকমের যজ্ঞ ক্রিয়া বন্ধ করে দিত। আসুরিক শক্তি এটাই প্রথম পরিচয় কোন পূজা অর্চনা করা যাবে না। এবার স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব হতে যাচ্ছে তাই অগ্নি খুব খুশী হয়ে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল, আবার যজ্ঞাদি ক্রিয়া শুরু হবে।

এইভাবে মনের ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলছেন। যোগীরা যখন সাধনা করেন তখন তাঁরা মনকে নিয়ন্ত্রন করেন। মনের ঠিক ঠিক সঙ্গী হল ইন্দ্রিয় সমুদয়। কঠোপনিষদে এই জিনিষটাকে ঘোড়া আর লাগামের সাথে তুলনা করা হয়েছে, ইন্দ্রিয়গুলো হল রথের ঘোড়া আর মন হল তার লাগাম। যেখানেই মন সেখানেই ইন্দ্রিয় থাকবে। আমাদের সব কিছুর দুরবস্থার মূলে ইন্দ্রিয়ের সাথে মন সব সময় যুক্ত হয়ে আছে বলে। যোগীরা মনকে ইন্দ্রিয় থেকে সরিয়ে বুদ্ধির সঙ্গে লাগিয়ে রাখেন। ইন্দ্রিয় আর বুদ্ধি এই দুটোর সাথে সংযোগ স্থাপিত হয় মনের দ্বারা। মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকা। যাঁরা যোগী, যাঁরা আধ্যাত্মিক জগতে এগোতে চাইছেন তাঁরা সব সময় চাইছেন মন তাঁদের নিয়ন্ত্রনে থাকবে। এটা আমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে যে কোন উচ্চতম যোগী আর নিকৃষ্টতম ভোগীর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। শুধু তফাৎটা হয় মনের ব্যাপারে। যিনি উচ্চতম যোগী তাঁরও মন আছে ইন্দ্রিয় আছে আর বুদ্ধিও আছে, যে নিকৃষ্টতম ভোগী তারও ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি আছে কিন্তু যোগী তাঁর মনকে ঘুরিয়ে দিয়ে সব সময় বুদ্ধির সাথে যুক্ত করে রেখেছেন আর চরমতম ভোগীর মন ইন্দ্রিয়ের ভোগের মধ্যে নিযুক্ত। মন এখন ভাবছে এই যোগীদের পাল্লায় পড়ে আমার জীবনটা অতীষ্ট হয়ে উঠেছে। মন ভাবছে যোগীদের অত্যাচারে আমার যারা ঠিক ঠিক সাথী সেই ইন্দ্রিয়গুলির সাথে আমি কোন খেলাই করতে পারছি না। যোগীরা আমাদের ঘুরিয়ে বুদ্ধির সাথে লাগিয়ে দেওয়ার ফলে আমরা ইন্দ্রিয়ের সাথে কোন খেলা করতে পারছি না। কিন্তু এইবার ভগবান আসছেন, ভগবান আসার ফলে এবার আমরা যত গোপাল বালকদের সাথে দুষ্টুমির খেলা করতে পারবো। মন এখন পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে যাবে, যত গোয়লিনী আছে তাদের হাড়ি ভাঙবে, মাখন চুরি করবে এই রকম যত বদমাইশি হতে পারে সব করার স্বাধীনতা পেয়ে যাবে। মনের যত রকমের বদমাইশি, দুষ্টুমি এই শ্রীকৃষ্ণ লীলাতে হতে যাচ্ছে, সেইজন্য মনের কি আনন্দ। এতদিনে আমি একটা পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে যাচ্ছি।

ভোগীদের যে ইন্দ্রিয়কে নিয়ে বাঁদরামো, বদমাইশি সেগুলো নিয়ে কোন শাস্ত্র লেখা হয় না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের লীলাতে মনের সব বদমাইশি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়ে ভক্তদের অনুধ্যানের বিষয় হবে। মনের বাঁদরামো, বদমাইশিকে এখন মানুষ পূজা করবে। মনের তাই কি আনন্দ, এখন আমি ইন্দ্রিয়ের সাথে যত খুশী বদমাইশি করতে পারবেও, ইন্দ্রিয়গুলো হল গোপাল বালকরা। এদের সাথে দুষ্টুমি, বাঁদরামো করা সত্ত্বেও আমার পূজা করা হবে। এর চাইতে আর কি আনন্দ হতে পারে! সেইজন্য মনের খুব আনন্দ। এতদিন যোগীরা আমাকে নিরোধ করে এসেছে, যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ, নিরোধ করতে করতে আমি ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে গেছি। এবার আমি স্বাধীন, শুধু আনন্দ আর আনন্দই করব। এই যে আনন্দ, আর মনের পূর্ণ স্বাধীনতা আর তার সাথে মনের এই আনন্দ আর স্বাধীনতাকে নিয়ে ভক্তের অনুধ্যান ও পূজা এটাই তো সমস্ত শাস্ত্রের একটি ব্যতিক্রমি দৃষ্টান্ত।

আমরা এখানে নয়টি তত্ত্বের কয়েকটির ব্যাখ্যা করলাম, এইভাবে বাকি তত্ত্বগুলি অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু, আকাশ, নক্ষত্র, মন এরাও কেন খুশী হল তার বিরাট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আমরা সাধারণতঃ পঞ্চ তত্ত্বই শুনে এসেছি, কিন্তু অনেক সময় এই নয়টি তত্ত্বও বলা হয়। পঞ্চ তত্ত্বের আগে কাল, দিশা, মন আর আত্মা। ভগবান আবির্ভাব নিতে যাচ্ছেন শুনে এই নয়টি তত্ত্ব শুভ হয়ে গেছে। কেন শুভ হয়ে গেলে তার ব্যাখ্যা এই ভাবে দেওয়া হল। এই ব্যাখ্যার সাথে আমরা একমত কিনা সেটা কোন গুরুত্ব নয়, কিন্তু যিনি এর ভাষ্য দিচ্ছেন তাঁর কাছে এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। বলছেন ভগবান এবার মানবদেহে প্রকট হতে যাচ্ছে শুনে কাল শুভ হয়ে গেল। কেন শুভ হয়ে গেল? তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলছেন এই এই কারণে কাল শুভ হয়ে গেল। সেটা আবার এনারা কোথা থেকে নিচ্ছেন? আমাদের পরম্পরা থেকেই নিচ্ছেন। ভাগবতের আরও আগে আগে যে পরম্পরা আছে, সেই পরম্পরার মতে কাল আর ভগবানের মধ্যে যে সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে, সেই সম্পর্কের সূত্র ধরে এই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভাগবতের পণ্ডিতরা যখন কোথাও ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করেন তখন এই একটা দুটো শ্লোকের উপরেই কয়েকদিন প্রবচন চালিয়ে যাবেন, তখন কাল কে, কালের বাবা কে সব কিছু নাটকীয় ভাবে উপস্থাপন করতে থাকবেন। এইভাবে ব্যাখ্যা করাটাও খুব প্রয়োজনীয়। আমরা যখনই যুক্তি দিয়ে এগুলোকে বিচার করতে যাব তখন আমাদের মনে নানান ধরণের প্রশ্ন এসে হাজির হয়ে যাবে। কাল কেন পরম শোভন হল? এটাকে ব্যাখ্যা করার দুটো দিক

আছে, একটা হল আমাদের মনে প্রশ্ন হবে কাল কেন পরম শোভন হল, তখন এই প্রশ্নই আমার মনকে আন্দোলিত করে দিয়ে জানার আগ্রহ বাড়িয়ে দেবে। দ্বিতীয় হল ভাব, শ্রীকৃষ্ণের যাঁরা ভক্ত তাঁরা যখন এই জিনিষগুলো নিয়ে চিন্তন মনন করতে করতে তখন এতো গভীরে চলে যাবে যে, ঈশ্বর চিন্তনে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলবে। এই ধরণের ভাষ্যের মধ্যে পাণ্ডিত্য আর কাব্যিক সৌন্দর্য্য এই দুটো জিনিষ এক সাথে চলতে থাকে। এগুলোকে আমাদের খুব যুক্তি তর্ক দিয়ে বিচার করার জন্য নয়, ভাষ্যকাররা ধ্যানের জন্য এই ভাবে বর্ণনা করেছেন। ভাগবত প্রীতি আর ধ্যানের মানসিকতা যদি না থাকে তাহলে এই ভাষ্যগুলোর কোন মূল্যই থাকবে না। যেগুলো খুব নৈর্ব্যক্তিক সেগুলোকেও একটা শরীর দিয়ে একটা মূর্ত রূপ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার সাথে একটা মনও দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই মনের মধ্যে যে বিচিত্র অনুভূতি হচ্ছে সেটাকেই ভাষ্যকাররা তুলে ধরেছেন।

ভগবান আসছেন কৃষ্ণ পক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ এবার কৃষ্ণ পক্ষে মিলে যাবেন এটাই আনন্দের কথা। এবারে ভাদ্র মাসে ভগবান কেন এসেছেন তার ব্যাখ্যা করে ভাষ্যে বলছেন – ভদ্র মানে হচ্ছে কল্যাণকারী, এই মাসের সব কিছুই শুভ, ভালো, সেইজন্য ভগবান ভাদ্র মাসে এসেছেন। কিন্তু আমাদের কাছে এখন ভাদ্র মাস হচ্ছে অপয়া মাস, এই মাসে কোন রকম শুভ কাজ করা হয় না। কেন করা হয় না, এর কারণ হচ্ছে, এই মাসে ভগবানের আবির্ভাব হয়েছে তাই এই পুরো মাস অন্য কোন রকম অনুষ্ঠানাদি না করে একমাত্র ভগবানের চিন্তন করো। আমাদের অপয়া মাস দুটি, ভাদ্র আর চৈত্র – ভাদ্র মাসে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম আর চৈত্র মাসে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম, যাতে লোকের মনটা ভগবানের দিকে দেয়। ভাদ্র মাসে এমনিতে চাষবাশ কিছু হয় না, কোন কাজ থাকে না, তাই অন্য দিকে ফুর্তি না করে ভগবানে মন দাও, তাই বলে দিয়েছে ভাদ্র মাসে ভালো কিছু করতে নেই। আর অষ্টমী তিথি, মানে মাসের ঠিক মাঝখানে গিয়ে পড়ছে, এদিকেও আছে ওদিকেও আছে, তাই আরও শুভ হয়ে গেল। এদিকে আবার রাত্রির নিশিথে জন্ম। নিশিথ রাত্রি হল যোগীকুলের প্রিয় মুহূর্ত। এখানে ভাদ্র মাস, কৃষ্ণ পক্ষ, অষ্টমী তিথি, নিশিথ কাল এগুলো গুরুত্ব নয়, গুরুত্ব হল ভাবের। ঠাকুর বলছেন – একজন বাবলা গাছে দেখে ভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছে। বাবলা গাছ দেখে তার মনে পড়ে গেছে এই বাবলা গাছের ডালে কোদালের বাঁট হবে, সেই কোদাল দিয়ে শ্যামসুন্দরের বাগানে মাটি কোপান হবে, সেই মাটিতে সব্জী চাষ হবে, সেই সব্জী প্রভুর সেবায় লাগবে – এই ভাবতে

ভাবতে সে ঈশ্বরীয় ভাবে হারিয়ে গেছে। একটা বাবলা গাছকে দেখে যখন তাঁর ভাব এসে যাচ্ছে, সেখানে আধ্যাত্মিকতা কি উচ্চতায় যেতে পারে আমরা কল্পনাও করতে পারিনা। ঠাকুরের ভক্ত যাঁরা উত্তরপাড়া, কোন্নগরে থাকে তাঁরা যখন দেখে ৫৪/২ বাস যাচ্ছে তখন তাঁর মনে পড়ে যায় এই বাস বেলুড় মঠের পাশ দিয়ে যাবে, সেখানে ঠাকুর আছেন। ঠাকুরের কথা মনে হতেই তাঁর মনে ঠাকুর ছাড়া আর কিছুই আসবে না। যাঁরা ঠিক ঠিক ভক্ত তাঁরা ভক্তির আবেশে ঠিক এইভাবেই সম্পূর্ণ হারিয়ে যান। এগুলো কিন্তু একটুও বাড়িয়ে বলা হচ্ছে না, ঠিক এই জিনিষই হয়। যাঁরা খুব উচ্চমানের ভক্ত হয়, যাঁরা বৈধী ভক্তিকে অতিক্রম করে গেছেন তাঁদের ঠিক এই অবস্থাই হয়। এখানে ভাদ্র মাস, কৃষ্ণ পক্ষের কোন দাম নেই, এগুলোর ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষের মনে ভগবানের প্রতি ভক্তি, প্রেমের ভাবকে জাগ্রত করে দেওয়া হচ্ছে।

এই রকম বলছেন মধ্য রাত্রে যেখানে ঘন অজ্ঞান অন্ধকার সেখানেই ভগবান দিব্য প্রকাশ রূপে নিয়ে অবতীর্ণ হচ্ছেন। কাল, নদী, বৃক্ষ, জলাশয়, মধ্য রাত, ভাদ্র মাস, তিথি সব কিছুকেই আধ্যাত্মিকতার ভাষা দিয়ে বর্ণনা করা হচ্ছে। গীতার ভাষ্যতে যেমন আচার্য বলছেন গীতার অর্থকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করার জন্য আমি এই ভাষ্য রচনা করলাম। এখানে কিন্তু অর্থকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে না, ব্যাখ্যা না কর এখানে একটা ভাবকে সৃষ্টি করা হচ্ছে। কাদের জন্য সৃষ্টি করা হচ্ছে? অতি সাধারণ লোক যারা, যাদের মন সব সময় কামিনী-কাঞ্চনের ভোগে লিপ্ত হয়ে আছে, তাদের মনে একটা ভাব তৈরী করার জন্য এই ধরণের ভাবকে সৃষ্টি করা হচ্ছে। একেবারে প্রথম থেকে শুরু করছেন, ভগবানের জন্ম হয় না, তাঁর প্রাকট্য হচ্ছে, তিনি আবির্ভূত হন। একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু হচ্ছে। তারপরে বলছেন ভগবানের আবির্ভাবের আগে সব কিছু শুভ ছিল, সব মঙ্গলময় হয়ে গিয়েছিল। কি কি মঙ্গলময় হচ্ছে তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, যখন সৃষ্টি হয় তখন তাতে নয়টি তত্ত্ব থাকে। সাংখ্য মতে সৃষ্টির চব্বিশটি তত্ত্বের কথা বলা হয়, প্রথমে প্রকৃতি কিন্তু মূল ব্যাপারটা পঞ্চ তত্ত্বে এসে থেকে যায়। কিন্তু মূল হল প্রকৃতি যেটা সত্ত্ব, রজ ও তম। প্রকৃতির পরেই আসে মহৎ, মহৎ এর পরেই আসে অহঙ্কার আর অহঙ্কার থেকে পাঁচটি তত্ত্বের জন্ম হয়। এই প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার আর পঞ্চ তত্ত্ব এই আটটিই মূল। পঞ্চ তত্ত্ব এসে গেলেই সৃষ্টি শুরু হতে থাকে। এই আটটিই মূল। এই আটটির পর যেগুলো আসে সেগুলো এরই সংমিশ্রণ, এই আটটিই

হল স্বতন্ত্র সত্তা। অন্যান্য কিছু কিছু মতে নয়টিকে স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলা হয়। প্রথমটাকে বলা হয় কাল, তারপর দিশা, পাঁচটি তত্ত্ব, মন ও আত্মা। ভগবানের আবির্ভাব হতে যাচ্ছেন বলে সবাই খুব আনন্দিত। সবারই আনন্দিত হবার কারণ আলাদা আলাদা। আমাদের মনে রাখতে হবে এই ব্যাখ্যাগুলো ভাগবতে কোথাও নেই, এর ব্যাখ্যা করছেন ঋষিতুল্য পণ্ডিতরা। ভাগবত শুধু বলছে এই নয়টি জিনিষ আনন্দে পরিপূর্ণ।

এর সাথে শুকদেব বলছেন *ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শুচিঃ। অগ্নয়শ্চ দ্বিজাতীনাং শান্তাস্তত্র সমিন্ধত।।১০/৩/৪।*শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় খুব পবিত্র শীতল বায়ু মিষ্টি মিষ্টি সুগন্ধ নিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, বায়ু এখন আনন্দে পরিপূর্ণ। কারণ কিছু দিন পরেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর লীলা শুরু করবেন। লীলা করতে করতে শ্রীকৃষ্ণ পরিশ্রান্ত হবেন, পরিশ্রান্ত হলে তাঁর কপালে স্বেদবিন্দু আসবে, এই স্বেদবিন্দুকে কে শুষ্ক করবে, আমি শীতল বাতাস দিয়ে শুষ্ক করে দেবো। এই ভেবেই বায়ু আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে এখনই সে শীতল হয়ে মিষ্টি মিষ্টি গন্ধে প্রবাহিত হতে শুরু করে দিয়েছে। বল্লভাচার্যের ভাষ্যে বলা হচ্ছে যাঁরাই ভগবানের শ্রীচরণ দর্শন করতে অভিলাষী, তাঁদের জন্য সব থেকে উৎকৃষ্ট সাধনা হল সেবাযোগ। কর্মযোগ মানেই সেবাযোগ। স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ এই সেবযোগের উপর খুব জোর দিতেন। যাঁরাই ভগবানের দর্শন পেতে চান তাঁদের জন্য সেবাযোগ অত্যন্ত উপযোগী। জগৎসেবার উপর স্বামীজীও খুব জোর দিয়ে গেছেন। জগৎসেবার দ্বারা আমাদের চিত্তশুদ্ধি হবে, চিত্তশুদ্ধি হলে ভগবানের দিকে এগোন সহজ হয়ে যাবে। মানবজাতির সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য বায়ু সবারই সেবার দায়ীত্ব নিয়ে নিল। আমাদের মনে রাখতে হবে এগুলো সবই ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যা। শ্রীরাম অবতারে বায়ুর ঔরস পুত্র ছিল শ্রীহনুমান। বায়ু বলছেন শ্রীরাম অবতারে আমার সন্তান ভগবানের খুব সেবা করেছিল, আমি কিন্তু ভগবানকে সেবা করা থেকে বঞ্চিত ছিলাম, কিন্তু এবার আমার ভগবানকে সেবা করার উত্তম সুযোগ পেয়েছি। কংসের অত্যাচারে সমস্ত যজ্ঞ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন যজ্ঞের সব অগ্নি নিজে থেকেই প্রজ্জ্বলিত হয় উঠল।

অন্য দিকে আবার *মুমুচুর্মুনয়ো দেবাঃ সুমানংসি মুদান্বিতাঃ। মন্দং মন্দং জলধরা জগর্জুরনুসাগরম্।।১০/৩/৭।* ভগবান আবির্ভাব হচ্ছেন শুনে কিঙ্কর আর গন্ধর্বরা মধুর

স্বরে গান করতে শুরু করে দিয়েছে, সিদ্ধ এবং চারণগণ ভগবানের স্তুতি করতে লাগল, বিদ্যাধরীরা অপ্সরাদের সাথে নৃত্য করতে লাগল এবং মুনি ঋষিরা পরিপূর্ণ হৃদয়ে পুষ্পবৃষ্টি করতে থাকল। জলভারবাহী মেঘমণ্ডলী সমুদ্রের সমীপে উপস্থিত হয় মন্দ মন্দ গর্জন করতে শুরু করল। বাদল মেঘ বলছে ভগবান সব সময় সমুদ্রেই থাকেন, আমরা সমুদ্রের ধারে কাছে যেতে পারি না, কিন্তু এবার তিনি আমাদের এলাকাতেই আসছেন, তাই এবার আমরা তাঁকে দর্শন করতে পারবো আর যখন রৌদ্র কিরণ তাঁর উপর তাপ বিকিরণ করবে আমরা তাঁর মাথার উপর অবস্থান করে ছায়া দিয়ে তাঁকে শীতলতা প্রদান করতে পারবো। এই ভেবে মেঘেদের মনে খুব আনন্দ হচ্ছে আর তারাও মৃদু মৃদু গর্জন করে চলেছে।

ভগবান রোহিনী নক্ষত্রে জন্ম নেওয়ার ব্যাখ্যা করছেন – ভগবান দেবকীর গর্ভে জন্মে নিতে যাচ্ছেন তাই রোহিনী অসন্তুষ্ট হতে পারেন। কিন্তু ভগবান কারুকেই অসন্তুষ্ট রাখতে চান না, ভগবানের আবির্ভাবে সবারই মন যেন আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে, কারুর মনে যাতে কোন প্রকার ক্ষোভ না হয় তাই তিনি রোহিনীর নামে যে নক্ষত্র আছে সেই রোহিনী নক্ষত্রে জন্ম নেবেন বলে মন স্থির করে নিলেন। তাছাড়া এর আগে তিনি সূর্যবংশে জন্ম নিয়েছিলেন, এবার তিনি চন্দ্র বংশে আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন। চন্দ্রমার অনেক স্ত্রীর মধ্যে প্রিয় স্ত্রী ছিল রোহিনী, ভগবান চন্দ্র বংশে জন্ম নিতে যাচ্ছেন তাই চন্দ্রমার প্রিয় স্ত্রীর নামে যে নক্ষত্র সেই রোহিনী নক্ষত্রে তিনি জন্ম নেবেন।

এই হল ভগবানের আবির্ভাবের পূর্বাবস্থা। ভগবান যখন আসেন তখন তিনি নিজেই সব ব্যবস্থা করে নেন এবং জগতের সব কিছুকে শুভ ও মঙ্গলময় করে তোলেন।